সীমান্তের সুর

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা ৭৩

কণক মুখোপাধ্যায়

অন্তরতমেষু

লেখকের অন্যান্য বই

আবার আমি

অজানার অঙিনায়

আজও যা ঘটে

কে ডাকে আমায়

নীল সায়রে

জন্মান্তর রহস্য

বহুরূপে দেবতা তুমি

তান্ত্রিকসাধনা ও তন্ত্রকাহিনী

সম্মোহন

অবিশ্বাস্য

অশরীরী

জীবনের ওপার থেকে

সে আসে

সে কি এলো ফিরে

সাক্ষী

সাক্ষী সব জানে। ঠিক জানে। তবু মুখ খোলে না। কিচ্ছু বলে না। বলবে নাও কখনো। খালি দিনরাত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। হা-হুতাশ করছে—নিজের জ্বালায় নিজে জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছে। রাতে-দিনে চোখে ঘুম নেই।

বোবা সাক্ষী বলে কেউ গ্রাহ্য করে না ওকে। ভয়ও না। সবাই জানে, ওকে মেরে ফেললে কেটে ফেললে ও প্রতিবাদ করবে না, শাসন করবে না। প্রতিহিংসা নেবে না। কারো নামে কোনো নালিশ করবে না। নিজে কাঁদবে। আপনমনে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদবে দিনরাত। তবু ডাকবে তাদেরই, যারা আঘাত হেনেছে বারে বারে।

এখনো গায়ে কত বুলেটের দাগ কত ছুরির দাগ। ঘা শুকোয় নি। ঝরা রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। জল লাগলে লালচে তাজা রক্তের ছোপ জেগে ওঠে।

এ নির্বিকার নির্বিরোধী সাক্ষী কাদের জন্যে এত আঘাত সয়েছে? যারাই আশ্রয় চেয়েছে ওর কাছে, ওকে জড়িয়ে ধরেছে প্রাণের দায়ে, তাদের আপ্রাণ চেষ্টায় বাঁচাতে গিয়ে ওর এই দশা। বাঁচাতে পেরেছে কতককে। কতককে পারে নি। তাতে ওর খুব আপসোস কিন্তু। সেই হাহাকারে এখনও ওর মন ভরে আছে।

এই সবজান্তা বোবা সাক্ষীকে ঘাঁটাতে ভয় পায় সকলে। অবিশ্যি এখন। কী জানি বোবা সাক্ষী যদি কখনো মুখর হয়ে ওঠে, তাহলে একেবারে সর্বনাশ সবার। এ-সাক্ষী ন্যায়-অন্যায়ের প্রত্যক্ষদর্শী, তাই ওর ধারেবারে কেউ আসে না।

একদিন যারা খেলা করত ওর কোলে বসে, তারা আজ কেউ আছে কেউ নেই। এ-সাক্ষী কিন্তু কোল পেতে অপেক্ষা করছে তবু কেউ আসে না।

না আসুক কেউ। সাক্ষী তো দু'দিকের সবাইকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। এক করে রাখতে চায়। তাছাড়া ওর উপায় যে কিছু নেই। ওর আসল ব্যাপারটা কেউ জানে না। দুটো দিকের ডান-বাঁ—ওর ডান বুক বাঁ বুক। সাক্ষী নিজে মাঝের শিরদাঁড়া। ঝড়-বৃষ্টি গরম-ঠাণ্ডা সব মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে এই সাক্ষী অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে, মাঝখানে সীমারেখা হয়ে সাক্ষীবট।

সাক্ষীবট পুব-পশ্চিমকে ভাগ করতে দেয়নি। এত দয়ামায়ার শরীর ওর। কেউ কি খেয়াল করেছে ও শেকড় দিয়ে মাটির তলায় তলায় দু'দিকের বুককে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, বেঁধে রেখেছে, ও জানতে দেবে না এ সমস্ত গূঢ়তত্ত্ব। ও যে বোবা সাক্ষী। তা হোক ও ভাগ করতে দেয়নি। মিল করেই রেখেছে দুটোকে ।

এই সাক্ষী-বটের ধারের গাঁ আজ বসতিশূন্য, জনমানবহীন। কোথাও নিরালা পোড়ো মাঠ, কোথাও গাছ-গাছালি ভরা ঘন জঙ্গল। বসতি আজ চলে গেছে ওকে ছেড়ে অনেক—অনেক দূরে।

সাক্ষী বটের বাঁ দিকে পুব পাঞ্জাবের কাহান গড় গাঁ, ডান দিকে পশ্চিম পাঞ্জাবের সান্তপুরা। দুটি গাঁয়েরই সীমান্ত-চৌকি সাক্ষী-বট থেকে অনেক দূরে দূরে। দু' পারেই সীমান্ত-চৌকির কাছাকাছি ছোট ছোট সাদা ঢেউ খেলানো পাহাড়ের মতো মিলিটারী ক্যাম্প।

সীমান্ত চেক-পোস্ট।

লুকিয়ে-চুরিয়ে আসা আর মাল চালান দেয়াদিয়ির পথে পাহারা। এদিকের লোকের অপরদিকে প্রবেশ বে-আইনী, পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া। তাই দু'দিকেই পাহারার তোড়জোড় চলেছে দিনরাত।

রাতের অন্ধকারে আবার আরো বেশী ভয়াবহ এই সীমান্ত। নিশুতি রাতে পা টিপে টিপে ছায়ামূর্তির আনাগোনা। বাতাসের হিসহিসুনিতে ফিসফিসুনি। কত লোকের হাহাকার মেশানো নিঃশ্বাস কবর-শ্মশান থেকে উঠে এসে জমা হয় এই সীমারেখার দু'ধারে—পরিচিতের পরিচয় অনুসন্ধানে।

রাত-জাগা প্রহরী লালচোখে এগিয়ে আসে। তার বুটের মশমশানি আওয়াজে কাঁপুনি লাগে সীমাভূমিতে।

বুকভরা সাহস নিয়ে তবু এগুতে থাকে সেপাই। চ্যালেঞ্জ করে।

কোন্ হ্যায়? জবাব পায় না। সব অদৃশ্য—তার চোখের দেখা হারিয়ে যায়। তন্দ্রা ঘোর কেটে যায়। চোখ রগড়াতে রগড়াতে ফিরে আসে চেক-পোস্টে।

নিত্যিকার ঘটনা এটা। ওপর মহলের গুজব, দু'দিককার সেপাইদের যোগসাজসে চোরাকারবার চলছে দারুণ। ক্ষেতের জিনিস পাচার হতে হতে সোনা-রূপোয় এসে দাঁড়িয়েছে এখন। চোরা-কারবারীরা নাকি নিশীথের বুক চিরে আসা-যাওয়া করে, কারবার চালায়।

ছায়ামূর্তির কথা নিছক বাজে রটনা। দুষ্কৃতকারী আর লোভী-লালচী সেপাইদের কাণ্ড এটা। এত বাড় বেড়ে গেছে এই চোরা-কারবারা আর সেপাইরা যে, যাও বা আশপাশের গাঁয়ের বসতিতে দু-একটা লোক আছে এখনো, তারাও তিষ্ঠতে পারবে না বেশীদিন। মেয়ে চুরির হিড়িকও নতুন করে শুরু হয়েছে।

ক'দিন ধরে এই জঘন্য কাণ্ডটা বেড়ে উঠেছে বড্ড। একজন নাম করা দুঁদে ইন্সপেক্টরকে পাঠানো হয়েছে ইন্সপেকশনে। এই জাঁহাবাজের কাছে কোনো অন্যায়ের ক্ষমা নেই। আইনের অনুগত হিসেবে খুব সুনাম তার। ইন্সপেক্টর খুব রাশভারি। সেপাইরা তটস্থ। কখন কার কী অন্যায় ধরে বসে, কার নামে কি চার্জশীট দিয়ে দেয়।

সকাল-সন্ধ্যের বেশী সময়ই ইন্সপেক্টরের কথা সেপাইদের মুখে মুখে আলোচনায় ঘুরেফিরে বেড়ায়।—ইন্সপেক্টর ব্যাটা কবে যাবে এখান থেকে বদলী হয়ে! ব্যাটা নির্ঘাত যমদূত, অশান্তির প্রতিমূর্তি!

ইন্সপেক্টর কিন্তু পরোয়া করে না কারো কথা। সে বেপরোয়া,

কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই। ভয়ডর নেই, দুর্দান্ত সাহস। রাতেদিনে চোখে ঘুম নেই। রাত্রির নিস্তব্ধতায় হঠাৎ সেপাইরা দেখে, পেছনে ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে। কেমন করে নিঃসাড়ে আসে !

সেপাইদের বিস্ময় জাগে। ইন্সপেক্টর হয়ত এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে প'ড়ে চৌকিতে, অসম্ভব আসা। আগেকার কোনো ইন্সপেক্টর আসেনি এভাবে কখনো।

নিভৃতে নিশুতি রাতে একটু আওয়াজ শতগুণ হয়ে বেজে ওঠে। একটা মানুষের পাশে-পেছনে নিঃশব্দে চুপিসারে এসে দাঁড়ানো কেমন করে সম্ভব !

ইন্সপেক্টরের রূপ ধরে আসে নিশ্চয় কোনো অশরীরী। প্রহরীর দাঁতে কাঁপন লাগে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। চোখ বুজে ফেলে ভয়েময়ে।

একটু পরে চেয়ে দেখে, কেউ কোথাও নেই। তবে কী ইন্সপেক্টরের দুঁদেপনা মনের কোণে বাসা বেঁধেছে ! সেই দুর্বলতাই প্রকৃতির আকর্ষণে ঘুমের ঘোরে, দুর্বল মুহূর্তে রূপ পায় !

ডিউটি শেষে সেপাইদের মধ্যে—সাথীদের সাথে রাতের গোপন কথা কানাকানি হতে থাকে। সকলেরই এ-দৃশ্য দেখা।

চিন্তা ঘোলাটে হয়ে যায় ওদের। পয়জমা—ভূত। এরা এক বহু হয়ে, বহু রূপ ধরে একই সময়ে। নিশ্চয় একটা এইরকম কিছু হবে।

সাহস-সংশয়-নিরুৎসাহে সেপাইদের পাহারা প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

ইন্সপেক্টর ধমক দেয়।

সেপাইরা সব বেইমান। ফের যদি ছুতো করে বুদ্ধু সাজে তাহলে কাউকে ছাড়া হবে না। বদমাশদের ন্যাকামি ধরতে পারা গেছে। রোজ রাত্তিরের টহলই সবার চালাকি-হিম্মত জানতে পারা গেছে।

ভূত-দর্শনটা মিথ্যে বানানো গল্প স্রেফ। কর্তব্যে কোনোরকম ত্রুটি হলে এবারে কি করা হবে, বুঝবে তখন সকলে। থানা কাঁপে

প্রহরী কাঁপে সীমানা কাঁপে। রাত্রির নির্জনতা অন্ধকারে মুখর হয়ে ওঠে।

এবার থেকে এপাশ-ওপাশের পিঠোপিঠি সেপাইদের লক্ষ্মীর আরাধনা বন্ধ করে দিয়ে সজাগ থাকতে হবে। জ্যান্ত-ভূত এই ইন্সপেক্টরের জন্য সকলে হুঁশিয়ার। পুব পাঞ্জাব আর পশ্চিম পাঞ্জাবের ধারেকাছের ভায়েরা—দোস্তেরা।

সুঠাম দীর্ঘদেহী ইন্সপেক্টর। ছাতি ফুলিয়ে চলে যখন, যেন প্রত্যেক প্রহরীর বুকের পাঁজর ভেঙে গুঁড়িয়ে চলে। সেপাইদের দম বন্ধ হয়ে আসে। ইন্সপেক্টরের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না মোটে। চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ওরা। সোয়াস্তি পায়।

কিছুতেই মেয়ে চুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না। ইন্সপেক্টর রোঁদে বেরুচ্ছে রোজ তবুও না। বিরক্ত হয়ে ওঠে ইন্সপেক্টর। না, আর চুপ করে থাকাটা বোকামি। ভয় দেখিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না। হবেও না। তড়িঘড়ি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে। তা যে কোনো উপায়েই হোক—যাক প্রাণ থাক মান।

সেপাইদের ওপর ঢালাও অর্ডার—দিনরাতে যে কোনো সময়, কাউকে সীমানা পেরনোর ব্যাপারে সন্দেহ হলেই চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ অমান্য করে যদি কেউ পালায়, দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার।

সেপাইদের চোখে-মুখে অবাক বিস্ময়।

এর আগে এত শীগগির এ-অর্ডার কোনো ইন্সপেক্টর দেয়নি। নরম চাউনির মানুষ ওই ইন্সপেক্টর, কিন্তু ওর ভাষা এত রূঢ় হয় কী করে! পুব-পশ্চিমের রক্তরেখার সীমানায় অগুণতি স্ত্রী-পুরুষের আত্মা কী ওর ঘাড়ে চেপে কাজ করায়, ওকে ঘুরিয়ে বেড়ায়? এই পঁচিশ বছরের জোয়ান-মদ্দকে অসম সাহসী করে তোলে? একা একশো!

যখন তখন হুট হুট করে এসে পড়ে সেপাইদের তদারকে। সময় নেই, অসময় নেই, একেবারে নাওয়া-খাওয়া ভুলে। খালি টহল আর টহল। সেপাইদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে—রোজ মেয়ে

চুরি! এরা থাকতেও, আশ্চর্য! ইন্সপেক্টরের মাথার ভেতর রক্তের টগবগানি।

প্রহরী কর্তার সিংয়ের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয় ইন্সপেক্টর। আঁতকে ওঠে কর্তার সিং। কাঁপা হাতে সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়ায়

—গাফেল মত শো—অন্যমনস্ক হয়ো না!

যাক বাঁচা গেছে, এই বিচিত্র মনোভাবের ইন্সপেক্টরের হাত থেকে। খোশ মেজাজে আছে, তাই পার্শি ছন্দে সাবধান করলে, নইলে রুক্ষ ভাষা বেরিয়ে আসত অনামুখোর মুখ থেকে। জাহান্নমমে অভী ভেজ দুঙ্গা বদমাশ লোককো।

কর্তার সিংয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে ইন্সপেক্টর—সেপাই! লক্ষ্য করেছ দূরে, কারা চলে যাচ্ছে! চ্যালেঞ্জ কর।

চ্যালেঞ্জ করা হল। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তারা গ্রাহ্য না করে।

ইন্সপেক্টরের চোখ ঠিকরে আগুন বেরুচ্ছে।

—বেয়াদব! গুলি করলে না কেন?

কর্তার সিংয়ের চোখে চাপা কৌতুক। ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর হাসির রেখা। যাক পালিয়ে গেছে ওরা এতক্ষণে। বাঘের মুখে পড়েও নির্বিঘ্নে সরে পড়তে পেরেছে যে, তাই রক্ষে।

কর্তার সিংয়ের হাবভাব ইন্সপেক্টরের চোখে নিখুঁত ভাবে ধরা পড়ে।

রাগে ফেটে পরে ইন্সপেক্টর। নীরবতা ভেঙে গর্জে ওঠে, তুম্ নিমকহারাম! হারামী! হিংস্র সিংহ যেন তার সামনের শিকারকে আক্রমণ করতে উদ্যত।

কিছুক্ষণ আগের তামাশা করা মানুষটা চলে গেছে। তার জায়গায় এসেছে রাতের বিভীষিকা, সাক্ষাৎ মৃত্যুর রূপ। কর্তার সিংয়ের বুক কেঁপে ওঠে। আটকানো কান্নায় কাঁপা গলায় বলতে থাকে—কসুর হুয়া, মাপ কীজীয়ে সাহব!

—বহুত হুঁশিয়ার !

গটমট করে চলে যায় ইন্সপেক্টর, যে ধারে মিলিয়ে গেছে, লুকিয়ে সরে পড়েছে তার শিকার।

কর্তার সিং চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বুকের ভিতর গুড়গুড়ুনি।

সাহেবের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, কী জানি কী রিপোর্ট করে বসে! কী চার্জশীট দিয়ে দেয়! কর্তার সিংয়ের ভবিষ্যৎ ভীতি হাতে হাতে ফলে গেল। পরদিন জানতে পারলে, কর্তার সিংয়ের নামে নোট পাঠিয়েছে ইন্সপেক্টর।

কর্তার সিং বিশ্বাসঘাতক। আইন ভঙ্গকারীরা গোপনে আসা-যাওয়া করে। কর্তার সিং তাদের পাহারা দেয় সবার চোখে ধুলো দিয়ে। ইন্সপেক্টরের চোখে পড়েছে যখন, তখন তারা নাগালের বাইরে। কর্তার সিং বেইমান!

সেপাই মহলে কানাঘুষো—কার নসীবে কী আছে কে জানে! চাকরিটা বজায় রাখবার তাগিদে অকারণ রাত ডিউটির সেপাইরা ফায়ার করে বসে। আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসে ইন্সপেক্টর। সেপাইকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার? লোক এপার-ওপার করছিল? চ্যালেঞ্জ করতে পালিয়ে গেল, তাই ফায়ার।—সাবাস! ধরতে চেষ্টা করবে।

—ঘাবড়ে যেয়ো না! ইন্সপেক্টরের গলা মোলায়েম।

সেপাইদের সমবেত গুঞ্জন।

—ব্যাটাকে খুব ঠকানো যাচ্ছে, এইবার আসল দাওয়াই পাওয়া গেছে! হাসি-খুশী ভাব সকলের।

দিনকতক যেতে না যেতে সন্দেহচিত্ত ইন্সপেক্টর দ্বিগুণ সন্দেহে উগ্র মেজাজী হয়ে উঠলো।

এখনো পর্যন্ত কেউ এ্যারেষ্ট হল না! অথচ রোজই রাতে ফায়ার! এ-এক রহস্য চলেছে মন্দ নয়। নিশ্চয় সেপাইরা তার সঙ্গে চালাকি করছে। তাদের নিজেদের যোগসাজসে গোপন কাজের সুবিধে করে নিয়েছে। কাজ ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে পুর্বের মতো।

পেশীবহুল দেহে সমস্ত পেশী ফুলে ওঠে ইন্সপেক্টরের—ইস্পাতের মতো কঠিন। লালচে মুখ রক্তবর্ণ। চোখের নীল তারার কোণে লাল ছোপ। বুকের ওঠানামায় সমুদ্রের ঢেউ। নিশ্বাসে গ্রীষ্মের মানুষ-মারা লু-চলা হাওয়া।

এবারে চৌকিতে কাউকে না জানিয়েই চেকপোস্ট থেকে খানিক দূরে ঘাপটি মেরে লক্ষ্য করতে হবে।

ঝুরঝুরে বৃষ্টি সারাদিন থেমে থেমে ঝরেছে। রাতে এক নাগাড়ে চলছে। বর্ষাতিতে আগাগোড়া ঢাকা ইন্সপেক্টরের। গাছের আড়ালে শুয়ে আছে যুদ্ধ-সৈনিকের মতো ওৎ পেতে শত্রু সন্ধানের জন্য।

অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারকে আরো জমাট করে তুলেছে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। চারদিকে ঘিরে ধরেছে একটা থমথমানি ভাব।

নিশ্চয় আসবে না কেউ এই দুর্যোগের রাত্তিরে। প্রকৃতির খেয়ালী-পনায় উৎকণ্ঠাই বাড়িয়ে দিচ্ছে কেবল। কখন কী রূপ ধরে কে জানে!

ইন্সপেক্টর ফেরার পথে। আচমকা দড়াম দড়াম আওয়াজে চমকে উঠলো, থমকে দাঁড়ালো। কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না! বিষাদে ভরে গেল ইন্সপেক্টরের মন—পালাল নাকি! ধরা গেল না! না, রোজের মিথ্যে ফায়ার!

ইন্সপেক্টরের টর্চের আলোয় জ্বল জ্বল করে উঠলো কাহান-গড় চেকপোস্টের সেপাইয়ের মুখ। সে ফায়ার করেছে শুধু-মুধু। নির্লিপ্ত মুখই প্রমাণ। ইন্সপেক্টরের আসার আওয়াজে বিশ্বাসী-সজাগ সাজবার ভান এটা।

সেপাই-মহলে জোর গুজব—নজর সিং ইন্সপেক্টর সাহেবের খুব পেয়ারের হয়ে উঠেছে। ওর জন্যে নানান অসুবিধে হচ্ছে সবার। ও সকলেরই নামে সাহেবের কাছে চুকলি খায়।

নজর সিংকে নতুন ইন্সপেক্টর বিশ্বাস করে, ভালোবাসে।

পিঠে হাত চাপড়ে বলে—নজর! তুমি নতুন এখানে, বুঝেসুঝে। দেখো যেন এদের দলে ভিড়ে পড়ো না। নিমকহারামি করবে না মোটে!

একগাল হেসে সেলাম জানায় নজর। নির্ভীক গলায় বলে, জী হুজুর! জান দেঙ্গে, তব ভী ইজ্জৎ রুখেঙ্গে।

—সাবাস! সাবাস!

ইন্সপেক্টর বলে চলে যায়। অন্য সেপাইরা দেখেশুনে হিংসেয় জ্বলে মরে। মনে মনে নজরেরও ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বংশ নিপাত করতে থাকে।

—কৌন্? ঠাহর জায়ো! ঠাহর জায়ো! রাইফেল কাঁধে তুলে নেয় নজর সিং।

এত বড় দুঃসাহস! এত আস্পর্ধা! নজর সিংয়ের নজর এড়িয়ে পালাবে? এ অন্য সেপাই নয় যে, রেহাই পাবে। অন্যায়কে রেহাই দিতে জানে না নজর। সে নতুন ইন্সপেক্টরের নতুন আদর্শ সাকরেদ। অবাধ্য অপরাধী এখনো রাইফেল রেঞ্জের ভেতর। ঠিক আছে।

রাইফেল উঠিয়ে লোড্ করে নিলে নজর। নিশানার জন্য রাইফেলের ইউ-আইকে সমান লাইনে নিয়ে এল। ট্রিগার টিপে দিলে লক্ষ্য স্থির করে।

দড়াম দড়াম দড়াম!

সীমান্তের বুক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো। লুটিয়ে পড়লো লোকটি। তাজা রক্তের চাপ বাঁধতে শুরু করেছে। নজর সিংয়ের অফুরন্ত খুশী চোখে-মুখে উথলে উঠছে।

বোরখা-পরা মেয়েটির বুকফাটা প্রাণ গলানো কান্নায় আকাশ বাতাস তোলপাড় করে তুললে।

ছুটে এলো মেয়েটি, যেখানে লোকটি সবে মাত্র শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করলে।

নজর সিংয়ের চোখে আনন্দের ঝিলিক মেরে যায়।—ইন্সপেক্টর সাহেব খুশী হবে। হাতেনাতে ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটিকেও। পালাচ্ছিলো বোধ হয় দুজনে। একটা ঢিলেই দুটো কুপোকাৎ। একজন পড়তেই অন্যজন—লুকোনো মেয়েটি বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হল। থাকতে পারলে না আর।

বহুদিনের তল্লাসী উদ্বেগ হয়রানির যবনিকা টেনে দিলে নজর সিং। নজর সিং ইনাম পাবে ইন্সপেক্টর সাহেবের কাছে। ওপর-ওয়ালাদের কাছে—নিশ্চিত প্রমোশন।

কান্নাভেজা গলায় বোরখা-ঢাকা মেয়েটির করুণ আর্তনাদ। আছড়ে পড়লো লোকটির রক্তমাখা নিষ্প্রাণ বুকের ওপর।

ইন্সপেক্টরও এতক্ষণে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির পাশে।

নজর সিং সেলাম ঠুকলে ইন্সপেক্টরকে। আত্মপ্রত্যয়ীর কণ্ঠস্বর নজর সিংয়ের গলায়।

—পরেশান আসান হুয়া সাহব। হয়রানির শেষ হল সাহব।

নজর সিংয়ের মুখের দিকে তাকালে ইন্সপেক্টর।

—ক্যা কিয়া নজর! এ তুম ক্যা কিয়া!

বিস্ময়-বিমূঢ় নজর।

॥ ১ ॥

ক'দিন ধরেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ঝমঝমানি। রাত বাড়ছে আরো। শাঁ শাঁ হাওয়া বইছে। শ্রাবণের শেষ বর্ষায় অসময়ে শীত নামিয়ে দিয়েছে।

রাত দুটো।

লোহারি গেটের সমস্ত বাড় ঘুমন্তপুরী। কেবল হাফিজসাহেবের

দোতলার জানলাটা বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে জেগে বসে। ভেতরের খাটখানা ঘুমের ঢুলুনি আর নেশার ঝিমুনিতে দুলে দুলে উঠছে।

জানলার ধারে গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছে শাফ্‌ন্নিসা বেগম। ভেবেই চলেছে শুধু। কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না কোনো। তার উদাসী দৃষ্টি আটকে পড়েছে অসীম শূন্যে। পাশে, খাটে শুয়ে হাফিজ সাহেব। নেশার ঘোরে আবোলতাবোল বকে চলেছে।

—আকবরের হারেমের প্রিয় বেগম তুমি শার্ফুন্নিসা! হাফিজ কত ক্ষমতা রাখে! আকবরের বুক থেকে কেড়ে এনেছি তোমায়—শার্ফুন্নিসাকে—নাদিরা বেগমকে। ছিনিয়ে এনেছি জাহাঙ্গীরের হৃৎপিণ্ড নিঙড়ে আনারকলিকে। শার্ফুন্নিসা—নাদিরা বেগম—আনারকলিকে কবর খুঁড়ে তুলে এনেছি।

কে বলে আনারকলি নেই? আনারকলির যুঁইফোটা মুখখানি হাফিজের কাছে বাঁধা, বিক্রি হয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। সে মুখ হাফিজের একলার এক্তিয়ারে। আর কারো নয়। আকবর জাহাঙ্গীরেরও না। যদি কেউ সে মুখ···খুন করে ফেলবো! খুন করে ফেলবো! কিছুতেই ক্ষমা করবো না, দয়া করবো না।

চমকে ওঠে শার্ফুন্নিসা।—খুন!

খুন কথাটা শার্ফুন্নিসার মাথার সমস্ত স্নায়ুকে কেটে কেটে তছনছ করতে থাকে। তার দৃষ্টিপথে যেন ছায়ামূর্তিরা এক এক করে ঘোরাফেরা করতে থাকে। হাতছানি দিয়ে ডাকতে ডাকতে চলে যায় দূরে—বহুদূরে।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। শার্ফুন্নিসা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল হাফিজের কাছ বরাবর।

না, ক্লান্ত হাফিজ ঘুমিয়ে পড়েছে এবার। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগুতে লাগল শার্ফুন্নিসা। দরজায় হাত ঠেকাতেই বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। নিশ্চল নিশ্চুপ।

হাফিজের ঝিমিয়ে পড়া ধরা কণ্ঠের আওয়াজ।

—আনারকলির কবরে আহাম্মক সেলিম—জাহাঙ্গীর কী মিথ্যেই না লিখে লোকের চোখে ধাঁধা দিচ্ছে। 'অগর ম্যাঁয় বিনাম রুই ইয়ারই খুশ রা, তা কিয়ামৎ শুকর গয়াম কারদাগরি খুশ রা।—

আ-হা-হা-হা!—শেষ বিচারের দিনেও যদি প্রিয়ার মুখ দেখতে পেতুম একবার, স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাতুম।

হো-হো করে হেসে ওঠে হাফিজ। হাফিজ ঘুমোয়নি তাহলে। সব দেখেছে!

শার্ফুন্নিসার বুক কাঁপছে। মাথা ঘুরছে, সমস্ত শরীরটা থরথরিয়ে উঠছে। অবশ পা দাঁড়াতে দিলে না আর। শার্ফুন্নিসা বসে পড়ে।

হাফিজ আবার বলছে।

—জ্যান্ত সমাধি আনারকলিকে দেয়নি অকবর। নিন্দুকেরা অন্ধেরা আকবরের যাদু জানে না। হাফিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে গেছে আনারকলিকে। আকবর তুমিই আল্লা। আল্লা হো আকবর।

শার্ফুন্নিসা ভীরু-চোখে তাকিয়ে থাকে হাফিজের দিকে।

হাফিজ নেশায় বুঁদ। চোখ চাইতে পারছে না মোটে। এক ভাবেই বোজা। সরাবের মাদকতায় মগ্ন দেহের নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। গভীর নিদ্রার কোলে অচেতন হয়ে ঢলে পড়বে এখুনি। শার্ফুন্নিসার চনমনে চাউনি চারিদিকে।

এই সুযোগ, কেউ আটকাতে পারবে না। পেছু নিতে পারবে না। শার্ফুন্নিসা মলো কী বাঁচল, কোথায় গেল, জানবে না কেউ। জানতে পারবেও না কখনো।

শার্ফুন্নিসা এই জলভরা আকাশের নীচে হারিয়ে যাবে চিরদিনের মতো।

হাফিজের স্বপ্নের শার্ফুন্নিসার নাদিরা বেগমের আনারকলির জীবন্ত সমাধি হোক এই দুর্যোগের রাতে।

অধীর শার্ফুন্নিসা দরজা খুলে, চুপিসারে বেরিয়ে পড়লো।

।। ২ ।।

বোরখা-ঢাকা রূপসী শাফ্‌রুন্নিসা চলেছে জল-কাদায় মাখামাখি রাস্তা মাড়িয়ে। পা পিছলে পড়ছে, আবার উঠছে।

শাফ্‌রুন্নিসা যাবে কোথা? কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছে না। মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে জনপ্রাণীহীন রাস্তা দিয়ে।

এই ঝড়ের রাত, এই মৃত্যুর আহ্বানের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় না শাফ্‌রুন্নিসা। সে চায় এই রাতই যেন তার জীবনে একটি রাত হয়ে থাকে। এ রাতের শেষ না হয় কখনো।

বাঁচবার উৎসাহ নেই শাফ্‌রুন্নিসার, কিন্তু মরবার প্রবল ইচ্ছেটাও স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল ক্রমে।

শাফ্‌রুন্নিসার চোখে—রক্তের বৃষ্টি নামছে আকাশ থেকে। আর চলতে পারছে না। মাথা ঝিমঝিম করছে, সামনের সব ঝাপসা হয়ে আসছে। একটা না-জানা—রুখতে না-পারা দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসছে। এই পেয়ে বসার আচ্ছন্নতার কফিনে কী সমাধি নিতে হবে শাফ্‌রুন্নিসাকে?

সজাগ হয়ে ওঠে শাফ্‌রুন্নিসা।

দূর থেকে ভেসে আসছে একটা গম্ভীর-সুরেলা গলায় মিঠেল আওয়াজ। গভীর নিশীথে যেন স্বর্গের কোনো দেবদূতের কণ্ঠ।

—ও মাই ডার্লিং! ও মাই ডার্লিং!
ও মাই ডার্লিং ক্লেমেনটাইন!
দাউ আরট্ লস্ট এণ্ড গন ফর এভার,
ড্রেডফুল সরি ক্লেমেনটাইন্!

কী করুণ, মমতা মেশানো সুরে-ভাষায় জড়িয়ে ধরে রেখেছে চলে যাওয়াকে—অতীতকে আঁকড়ে ধরে! কোথা থেকে ভেসে আসছে? গীর্জা থেকে কী?

শার্ফুন্নিসা নিজের অগোচরেই টলতে টলতে এসে দাঁড়ালো গেটের সামনে।

না, গীর্জা নয়। বসত বাড়ি এটা।

একটু আশ্রয় আজ রাতের জন্যে কেবল। কলিংবেল টিপলে শার্ফুন্নিসা একবার—দু'বার।

কেউ গেট খুললে না। কেউ এল না। আসবেও না কেউ। তার তো কেউ নেই!

বর্ষার অবিশ্রাম ধারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শার্ফুন্নিসার চোখের জল অজস্র ধারায় ঝরতে লাগলো।

সামনের দোতলার ঘর থেকে তখনো গানের সুর পিয়ানোর আওয়াজে ভেসে আসছে—থেমে থেমে—মৃদু মৃদু।

নীল আলোর আভায় ঘরখানা ছেয়ে ফেলেছে—মেঘকাটা নীল আকাশের সরু সুতোয় গেরো বেঁধে।

ঝড়ের রুদ্রভাব শান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু শার্ফুন্নিসার ভেতরে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য চলছে। কে যেন পা দুটো ধরে মাটির তলায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নীচে—নীচে—আরো নীচে। গেটের সামনে আছড়ে পড়লো শার্ফুন্নিসা।

দোতলার পিয়ানো থেমে গেল। সুর কেটে গেল, তাল বেতাল হল।

—কী পড়ার শব্দ। একটা গোঙানি আওয়াজ। কার? কে—এত রাতে?

তরতর করে ওপর থেকে নেমে এল ডাঃ তমীশ মুখার্জী। গেট খুলে দেখে হতভম্ব।

রক্তে হাবুডুবু খাচ্ছে বোরখা-ঢাকা স্ত্রীলোকটি।

—কেউ কী খুন করে গেল? পাল্‌স দেখতে দেখতে ডাক্তারের চোখে-মুখে আশার চিহ্ন ফুটে উঠল।—যাক, ভাববার সময় নেই এখন। বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করলে বেঁচে যেতেও

পারে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে বড্ড দুর্বল হয়ে গেছে। বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

ডাক্তার পাঁজাকোলা করে ভেতরে নিয়ে গেল শার্ফুন্নিসাকে।

কোয়াগুলিন ইন্‌জেকশন দিয়ে, সেবা-যত্ন করে ক্রাইসিস পিরিয়ডটা কাটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল ডাক্তার।

হ্যাঁ, ডাক্তার যা ভেবেছিল—স্ত্রীলোকটি খুন হয়েছে—সেটা কিন্তু ঠিক নয়—ধারণা ভুল। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী ছিল। পোড়া অদৃষ্ট ওর। স্ত্রীলোকটি বাঁচবে, ওর সার্থক মা হওয়ার সম্ভাবনা হত্যা হওয়ায়—যে আঘাত, যে ব্যথা, যে শোক পাবে—তা কী সহ্য করতে পারবে সহজে? জ্ঞান হলে কী বলবে? কা সান্ত্বনা দেবে ডাক্তার? ডাক্তার দুশ্চিন্তায় পায়চারি করতে লাগল।

কী করা যায়, কী বলা যায়? এ অবস্থায়, এ রাতে, কেন পথে বেরুলো ও? চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ মাখানো। তবে?...

আস্তে আস্তে চোখ খুললে শার্ফুন্নিসা। ডাক্তার ফিডিং কাপে ভরা গরম হরলিকস একটু একটু করে খাওয়াতে লাগল।

—আপনার কোনো ভয় নেই ম্যাডাম! এখন কী সুস্থ?

আঁতকে ওঠে শার্ফুন্নিসা।—কে? হাফিজ! ক্ষীণ কণ্ঠে জানায়—আমায় ছেড়ে দাও! আমি যাব না, কিছুতেই না! অস্থিরতা বেড়ে ওঠে শার্ফুন্নিসার।

ডাক্তার আশ্বাস দেয়, ভালো করে দেখুন—আমি কে! আমি হাফিজ নই। ডাঃ তমীশ মুখার্জী।

চমক ভাঙে শার্ফুন্নিসার। অসহায় ভাবে বলে ওঠে—কোথায় আমি?

ডাক্তারের কথায় সহানুভূতি উপচে পড়ে। করুণায় গলে যায় অন্তর। শার্ফুন্নিসার আকুতিকাতর দৃষ্টি ডাক্তারকে চঞ্চল করে তোলে।

—এখানে নিরাপদ। যে ক'দিন ইচ্ছে থাকুন! কাউকে খবর দেব কী? কোনো জানা লোককে?

শাফু্ন্নিসার চোখে ভয়ের ছায়া। ডাক্তারের মায়াভরা চোখে ধরা পড়ে। উত্তেজনা-ভয়ের ব্যাপার না তোলা ভালো, এঁকে হার্ট বড্ড দুর্বল।

শাফু্ন্নিসাকে বিশ্রাম নিতে বলে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে ডাক্তার—এখন কেমন বোধ করছেন ম্যাডাম?

শাফু্ন্নিসা তার গোপন-অগোপন কোনোটাই চাপা দিতে, ঢেকে রাখতে চায় না। সমস্ত উজাড় করে দিতে চায় ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারের কাছে সব না বলা পর্যন্ত তার হাঁকুপাঁকু ভাব কাটছে না কিছুতেই। দম আটকে আসছে—দারুণ অস্বস্তি।

এই উদারমনা, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি ডাক্তার তমীশ মুখার্জীকে প্রবঞ্চনা করতে চায় না শাফু্ন্নিসা। এ রকম অমায়িক সাধু প্রকৃতির লোককে ধাঁধায় রাখলে, রাখতে পারা যায়। এমনিই একজন নির্লিপ্ত নির্বিকার সরল বিশ্বাসী ডাক্তার।

তবু শাফু্ন্নিসার মনে একটা খচখচানি বিঁধতেই থাকে অনবরত।

যা হয় হোক—ডাক্তারকে সব বলবে। শাফু্ন্নিসার দৃঢ় বিশ্বাস—কেউ খুন করে এসে আশ্রয় চাইলেও, আশ্রিতের কোনো অনিষ্টই করতে পারবেনা এ মানুষ। এর কাছে কারো বিপদের সম্ভাবনা নেই, বরং এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ক'দিনে ডাক্তারকে দেখে, তার আচার-ব্যবহারে, সেই সত্যিটাই প্রমাণ পেয়েছে শাফু্ন্নিসা।

কিন্তু বলি বলি করেও বলা আর হয় না শাফু্ন্নিসার।

ভোর রাত।

হাফিজের লাল নেশা ফিকে হয়ে এল—গোলাপী। শার্ফুন্নিসাকে ডেকে ডেকে সারা। চোখ বুজে শুয়ে শুয়েই ডাকছে হাফিজ—শার্ফুন্নিসা! শার্ফুন্নিসা! শার্ফুন্নিসা।

শার্ফুন্নিসা কোনোদিন তাকে সাড়া দেয়নি—অন্তত এক ডাকে তো নয়ই।

দেমাক দেখ না! রূপের দেমাক। হাফিজও অত হেলা ফেলার নয়। কতশত আওরত তার ইশারায় মেহেরবানির অপেক্ষায় দিন গুণছে। হাফিজ ওদের থোরাই কেয়ার করে। ওদের মুহব্বতকে—প্রেমকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আর এই শার্ফুন্নিসার গোলাম হয়েও মন পাচ্ছে না!

ছোট ঠিকাদার থেকে আজ আমীর হাফেজ। লোহারি গেটের বড় রহিস। বড় ব্যবসাদার। কী ব্যবসা না আছে তার—কাপড়-জামা, জুয়েলারী, মনিহারী—আরো কত কী।

নামডাক কত। বাইরে-রাস্তায় লোকে তাকে দেখলেই সেলাম ঠোকে—ছেলে-বুড়ো সকলে মিলে। কত ইজ্জত হাফিজ সাহেবের।

একটা মুখের কথা খসালে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট মায় মন্ত্রী-সান্ত্রী পর্যন্ত তার উমেদারী করে নিজেদের ধন্য মনে করে।

শহর-মফঃস্বল সব জায়গায়—গোটা পশ্চিম পাকিস্তানে হাফিজের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। কারো জান নেবার দরকার হলে, হাফিজের জন্যে প্রাণ দিতে এগিয়ে আসে অগুণতি বান্দা।

বান্দাদের কত খুনের কেসে জামিন হয়ে, কেস লড়ে উদ্ধার করেছে হাফিজ সাহেব। সে উপকারের বেইমানী কী করতে পারে

কেউ? ওরা নিমকহারাম নয়, হাফিজ তা ভালো করেই জানে। হাফিজের কাছে ওরা কেনা নফর—বান্দা।

হাফিজের চেহারাও খুব খাপসুরত না হোক, একেবারে অছেদ্দারও নয়। না হয় একটু মোটা বেশী, এই যা। কিন্তু বাইরে থেকে মোটা দেখালেও ফাঁপা বা থলথলে নয়, নিরেট। পঞ্চাশ বছরের হাফিজ লাঠি ধরলে, কুড়ি বছরের জোয়ানকেও মাথা বাঁচিয়ে পালাতে হয় এখনো। জোয়ানরা হাফিজকে 'শের'—'লাহোরের শের' বলে ডাকে।

শার্ফুন্নিসাকে ঘরে আনবার পর থেকে অন্য তিনজন বেগমের মুখদর্শন করে না হাফিজ। তবু শার্ফুন্নিসার মন গলে না।

হাফিজের রোষ-বিনয় কিছুই বাগে আনতে পারে না অবুঝ অবাধ্য শার্ফুন্নিসাকে।

এত সুখ, এত প্রেম, জীবনে পেয়েছে কী শার্ফুন্নিসা?

ফিকে গোলাপী নেশার আভাসও মিলিয়ে গেল সম্পূর্ণ। চোখ কচলে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল হাফিজ।

কই শার্ফুন্নিসাকে তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গেল কোথায়?

এঘর-ওঘর—সমস্ত বাড়িটার আনাচে-কানাচে পর্যন্ত তল্লাসী চালিয়েও শার্ফুন্নিসার সন্ধান পেল না হাফিজ। চাকর দরোয়ান-দেরও জিজ্ঞেস করে কিছু ফল হল না।

হাফিজের রক্তচক্ষু। চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি ফুলে পঞ্চাশ হয়ে উঠছে। ঘন ঘন নিশ্বাস, বুক ফেটে চৌচির হয় আর কি। গোঁভরে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

শয়তানী কোথায় যাবে? লাহোর শহর থেকে বেরুনো এখুনি বন্ধ করে দিচ্ছি। শার্ফুন্নিসা জানে না হাফিজের সহস্র চোখ চারধারে, গাঁ পর্যন্ত। কোনো জায়গায় পালিয়ে নিস্তার নেই। এ চোখ এড়াবার যো নেই কারো। আজ অবধি পারেওনি কেউ। কার ঘাড়ে কটা মাথা যে হাফিজের শার্ফুন্নিসাকে আটকাবে, লুকিয়ে রাখবে! যদি

কেউ শাফু´ন্নিসাকে আশ্রয় দেয়, তার মৃত্যু ঘানয়ে এসেছে নিশ্চয়। শাফু´ন্নিসা হাফিজের হকের ধন—বেগম—শাদি করা বেগম।

হাফিজ পাগলের মতো ক্ষেপে উঠল। হাতের নাগালের বাইরের শিকারকে শিকারী পাবার প্রবল উন্মাদনায় মেতে ওঠে।

থানা-পুলিসের খবরাখবর। পাড়ায় পাড়ায় অলি-গলির ভেতরও, কোথাও লোক লাগিয়ে, কোথাও নিজে গিয়ে খোঁজাখুঁজি চলতে লাগলো। এমন কি শহর ছেড়ে শহরতলী পর্যন্ত তোলপাড়—তন্ন তন্ন করে সন্ধান নিয়ে নিয়ে।

না কারো বাড়ি যায়নি শাফু´ন্নিসা। তাকে কেউ দেখে নি। দেখতে পেলে তখুনি আটকাবে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে হাফিজকে, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না হাফিজ।

শয়তানীর জন্যে সে কী না করেছে। একবার পেলে হয়। ওর প্রেমিক শয়তানকে আর ওকে—দুজনকে টুঁটি টিপে এক সঙ্গে শেষ করে দেবে হাফিজ। জ্যান্ত কবর দেবে শাফু´ন্নিসাকে। মুরদাকে—মরা দেহটাকে কুপিয়ে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াবে।

ক্রিশ্চান পাড়ার সান্দা রোডে ডাঃ তমীশ মুখার্জীর বাড়ি। বাড়িতেই চেম্বার। চেম্বারেও পেসেণ্টদের মুখে মুখে চাপা আলোচনা—হাফিজ সাহেবের বেগম শাফু´ন্নিসার নিরুদ্দেশ কাহিনী। ডাক্তারের কানে পৌঁছয়। ডাক্তার স্তম্ভিত। নিঃসন্দেহ চিত্ত ডাক্তারের মনে সন্দেহের নাগরদোলা ঘুরপাক খেতে থাকে—জ্ঞান হবার পর শাফু´ন্নিসার কওয়া প্রথম কথাকটা—

—কে? হাফিজ! আমায় ছেড়ে দাও! যাব না! কিছুতেই না!

ডাক্তারের সজল চোখ।

এই মেয়েই শার্ফুন্নিসা তাহলে! কী মিষ্টি কথা! কী অনুনয় বিনয়! কী ছলনা! একেবারে মাটির মানুষ! ভেবেছিলুম অসহায় স্বামী পরিত্যক্তা, কিংবা স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বেছে নিয়েছিল আত্মহত্যার পথ গর্ভ অবস্থাতেও। যীশুই এখানে এনে দিয়েছেন বাঁচাতে। পরিচয় চাইনি পাছে আঘাত লাগে। ধারণা ছিল, ভালোভাবে সুস্থ হলে তখন সব জানা যাবে'খন।

দেখে মনে হয়েছিলো, এ মেয়ে কোনো অন্যায় করতে পারে না, অন্যায় করেনি। অন্যায় করে বাড়ি থেকে পালায়নি। এর বুকে অনেক জ্বালা। অনেক গোপন ব্যথা। বুক জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, মুখ ফুটে বেরুচ্ছে না।

হাফিজ সাহেবের বেগম! যে স্বামী তার স্ত্রীকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে, পাগল হতে বসেছে—তাকে ত্যাগ! এত বড় অন্যায় বরদাস্ত করা যায় না—সইতে পারা যায় না। কিছুতেই না। এর ওপর আবার নাম ভাঁড়ানো! শার্ফুন্নিসা না বলে শীরী! ডাক্তার ছুটে চলে যায় ওপরে। শোবার ঘরে যীশুর ছবির সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে—ও লর্ড, ও ফাদার! ফরগিভ্-হার! ফরগিভ্ হার! সী ডাজ নট্ নো, হোয়াট সী হ্যাজ ডান!

খ্রীষ্ট ভক্ত—প্রকৃত ক্রীশ্চান ডাক্তার তমীশ মুখার্জীর দু'চোখের জল টপ টপ করে লাল কার্পেটের ওপর পড়ছে। জলের ফোঁটায় কার্পেটের ভিজে জায়গাটা তাজা রক্তের ছোপের মতো জ্বল জ্বল করে উঠছে।

ডাক্তারের অশান্ত মন খানিকটা শান্ত হল। দুঃসহ ভারটা হাল্কা হয়ে যেতে লাগলো।

শার্ফুন্নিসার ঘরের পর্দা ফেলা দরজার পাশে এসে টোকা মারছে ডাক্তার।

—ভেতরে আসুন!

ডাক্তারের মুখের দিকে চোখের দিকে চেয়ে শার্ফুন্নিসার বুক দুরদুর করে উঠলো। অমন স্বর্গঝরা সরল হাসি গেল কোথায়? মুষড়ে পড়েছে যেন ডাক্তার। তবে কী…।

সোফায় বসে পড়ল ডাক্তার। শার্ফুন্নিসার দিকে স্নিগ্ধ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

দেখে অস্থির হয়ে ওঠে শার্ফুন্নিসা। ডাক্তারের কাছে এগিয়ে আসে। নিজের অজ্ঞাতেই পাশে বসে পড়ে।

শার্ফুন্নিসার চোখের জলের টলটলানি উপচে পড় পড়। ডাক্তার অস্বস্তি বোধ করে। উঠে পড়ে, দরজার দিকে পা বাড়ায়।

—শুনুন! দয়া করে একটু বসবেন? ভিজে গলায় ধরা ধরা আওয়াজ শার্ফুন্নিসার। চোখের জলের স্রোত বইছে। পেছন ফিরে তাকিয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় ডাক্তার। সোফায় এসে বসে পড়ে আবার।

শার্ফুন্নিসার গলার আওয়াজ কাঁপছে, তবু বলে চলেছে অনর্গল ভাবে—

বিশ্বাস করুন! আমি চেয়েছিলুম সব বলতে, বলতে গিয়ে থেমে গেছি। পরে—আর একটু পরে না হয়। এই পরে বলার অন্যায় নেশাটাই আপনাকে আঘাত হেনেছে হয়তো। ক্ষমা করবেন! আমি ইচ্ছাকৃত অন্যায় করিনি কোনো দিন, করতে চাইনি, করব না কখনো। এটা বিশ্বাস রাখতে পারেন।

এটুকু অনুরোধ! হাফিজের হাতে যেন তুলে দেবেন না! তার চেয়ে আমি নিজেই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

আমার জীবনের কাল রাত্তিরের বুক থেকে যে ভাবে তুলে নিয়ে বাঁচিয়ে ছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন, তা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। চিরকৃতজ্ঞ।

ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে দেখছে শার্ফুন্নিসাকে আর শুনছে তার অসহায় অনুরোধ।

আবার কী ভুল করছি নাকি? ম্যাডামের কথায় তো কোনো খাদ নেই, কোনো ভেজাল নেই, একেবারে নিখাদ।

—যদি আপনার সময় হয়, দয়া করে শোনেন—আমার পালানোর ইতিহাস বলতে পারি এখুনি। শুনে আপনি বিচার করুন!

কী শুনবে, কী বিচার করবে? ডাক্তারের মাথায় তাল-গোল পাকিয়ে যায় দোটানায়—নীচে রুগীদের রোগের যন্ত্রণায় চোখের জল আর ওপরে ম্যাডামের মনের যন্ত্রণায় চোখের জল।

—যাকগে, পরে শুনবো'খন। নীচে অনেক পেসেন্ট। কমজোরী হার্টের রুগীদের বেশী বকা, উত্তেজিত হওয়া একেবারেই অনুচিত। উঠে পড়ে ডাক্তার।

ডাক্তারের চলা-পথে শাফু্ন্নিসার মুগ্ধদৃষ্টি—কী করুণাঘন চোখের শান্ত চাউনি, কী প্রাণ জুড়োন অমৃতঢালা স্বরে কথা ডাক্তারের!

শাফু্ন্নিসা সোফায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। পাশের ঘরে ডাক্তারের বিধবা মায়ের কানে অব্যক্ত যন্ত্রণাকাতর কান্নার আওয়াজ পৌঁছয়। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে ডাক্তারের মা—কৃষ্ণভামিনী দেবী।

শাফু্ন্নিসার অবস্থা দেখে হকচকিয়ে যায়, জড়িয়ে ধরে। সান্ত্বনা দিতে থাকে।

—ভাবনা কা বেটি শীরী! তোমার মালিক এসে নিয়ে যাবে শীগগির। তমীশকে ঠিকানা দাও, খবর দেবে। আমাদের এখানে কোনো ভয় নেই তোমার। ঈশ্বরের জিনিস ঈশ্বর নিয়েছেন, তাতে দুঃখ কী বেটি? আবার তুমি মা হবে।

এত সরল কৃষ্ণভামিনী দেবী!

এরকম মা না হলে কী ওরকম দেবতা ছেলে হয়! দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে শাফু্ন্নিসা।

নাম ভাঁড়িয়েছি সত্যি। কিন্তু কেন—ঈশ্বর তুমি তো সবই জানো। উপায় কা? অন্যায় বটে, তাছাড়া অন্য পথও ছিল না তো!

এই দেবীর কাছে মুখ দেখানোও পাপ। আমার জন্যে মা-ছেলের দেবতার স্বর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে শেষে? না, কখনোই তা হতে দেব না! আজ রাতেই, আজ···। অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে শার্ফুন্নিসা।

—মা, কিছু হয়নি। কিচ্ছু না। কৃষ্ণভামিনীর পায়ে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সামলাতে পারে না, নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না।

—ক্ষমা কর! ক্ষমা কর মা!

—ক্ষমা করবার কী আছে শীরী! শান্ত হও মা! এখানে কোনো দ্বিধা-সংকোচ করবে না! নিজের ঘরবাড়ি ভাববে। আমিও তোমার মা।

কৃষ্ণভামিনীর চোখ জলে ডবডবে হয়ে উঠল। শার্ফুন্নিসার আকুলি-বিকুলিই তার মাতৃস্নেহের বাঁধ ভেঙে স্রোত বইয়ে দিয়েছে। দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে সেই পবিত্র স্নেহের গঙ্গাজলের ফোঁটা শার্ফুন্নিসার মাথার ওপর।

দুর্ভাবনার উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে গেল শার্ফুন্নিসার।

কৃষ্ণভামিনী আর শার্ফুন্নিসার—ধর্ম মা আর বেটির কান্না থামল।

শার্ফুন্নিসা নিশ্চিন্তের পরিতৃপ্তিতে দেহ এলিয়ে দিয়ে সোফায় ঘুমিয়ে পড়ল।

লোহারী গেটের রুগী শয়দা। শয়দা ডাক্তারকে স্পষ্ট করে বললে, কোনো কিছু গোপন না রেখেই—

যার কাছে আছে শার্ফুন্নিসা বেগম, তাকে ছাড়বে না হাফিজ। অমন ভালো স্বামী ছেড়ে, বেকুফ কোথাকার, শেষে কিনা বাবুর্চির সঙ্গে পালালো! ঘেন্নায় মরি ডাক্তার সাব!

ধরা পড়লে তোর আর তোর সোহাগের বাবুর্চির মাথা থাকবে? বারণ করেছিলুম তখন হাফিজ সাহেবকে। ছোঁড়াটা যেন কেমন কেমন। ওটাকে অন্দর মহলে রাখা ঠিক হবে না। বেগমদের কাছে খোজা রাখাই ভালো। তা শুনলেন না উনি, অগ্রাহ্যি কথায়।

এক সময় ঠিকেদারীতে দুজনে খুব দোস্তি ছিল। আমি ওর চেয়ে বড় ঠিকেদারই ছিলুম। সবই নসীব ডাক্তার সাব। আজ আমি ফকির-গরীব বান্দা ওর।

বেঁচে থাকুন খুদার মেহেরবাণীতে আপনি। আপনাদের দানে—ওষুধ-পথ্যে আমরা বেঁচে আছি এখনো!

ও শালা হাফিজ কী ভালোটা করেছে কার? খুদা আছে, খুদা আছে ডাক্তার সাব! আজ বুক চাপড়াতে হচ্ছে। অনেকের বুকে লাথি মেরেছে, সরাকে ধরা দেখেছে।

ডাক্তার একটার পর একটা ধাঁধার ফেরে আটকে পড়েছে। একটা না কাটিয়ে উঠতে উঠতে আর একটা।

বাবুর্চির সঙ্গে শাফ্র্নিসার···। থাক, নোঙরা কথা! এসব ভাবাও খারাপ। যীশু তুমি শুভমতি দাও ম্যাডামের!

হাফিজ যে রকম রাগী, ম্যাডামকে খুঁজে পেলে খুন করেই ফেলবে।

ম্যাডাম ভুল করেছে। ভুল মানুষ মাত্রই করে থাকে—'যীশু প্রশ্ন করলেন—তোমরা মেয়েটিকে পাথর ছুঁড়ে মারছো কেন?'

দল বেঁধে উত্তর এল—'ও পাপী, ভ্রষ্টা! মরা উচিত!'

আবার যীশুর জিজ্ঞাসা—'কেউ এমন একজন যদি থেকে থাক এই দলের মধ্যে, যে জীবনে কোনোদিন কোনো মুহূর্তেও পাপ করেনি, পাপের চিন্তা—খারাপ চিন্তা স্বপ্নেও করেনি—সেই লোকই একমাত্র এই পাপীকে মারবার অধিকারী।'

নোঙরা কথা মনের কোণে পুষে রাখাও পাপ—অনুচিত।

ডাক্তার মনের গ্লানি ঝেড়েঝুড়ে হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এল।

ক'দিনে শাফু´ন্নিসা যেন কত আপনার হয়ে গেছে। শাফু´ন্নিসার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল ডাক্তার। দরজা খোলা, পর্দা সরানো। কৃষ্ণভামিনীর কোলে মাথা রেখে অগাধে ঘুমুচ্ছে শাফু´ন্নিসা।

ডাক্তার ঘরে ঢুকতেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করলে কৃষ্ণ-ভামিনী—কথা না কইতে।

ডাক্তারের নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি কিছুতেই ফিরতে চাইছে না শাফু´ন্নিসার মুখ থেকে।

ডাক্তার দেখছে, বাইশ-তেইশ বছরের সুশ্রী তরুণী শাফু´ন্নিসা দশ বছরের মেয়ে হয়ে গেছে যেন। ঘুমন্ত মুখে অপরিসীম শুদ্ধ আনন্দ উছলে পড়ছে, কলঙ্কের কোনো লেশ নেই। ফুরফুরে হাওয়ায় এলোমেলো কালো কোঁকড়ানো চুলের ছোট ছোট টুকরো গোলাপী কপালে খেলা করে চলেছে অবাধ গতিতে।

ডাক্তার মুগ্ধ-নয়নে দেখছে আর ভাবছে।

হ্যাঁ, সত্যিই শাফু´ন্নিসা নামের উপযুক্ত মেয়ে ম্যাডাম। শীরী বলুক, নাম ভাঁড়াক, মিথ্যে বলুক, তবু ম্যাডামের তুলনা নেই। যা বলেছে যা করেছে—তা ভয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে। যা বলতে পারেনি—তা লজ্জায় ঘেন্নায় ইজ্জতের দায়ে।

দরকার নেই কোনো পরিচয় ম্যাডামের। ম্যাডামের পবিচয় ম্যাডাম নিজেই।

না, না, কিছুতেই তুলে দিতে পারা যায় না এই সদ্য-ফোটা কমলকে। হাফিজের হাতে তো নয়ই। কে না জানে হাফিজ কেমন চরিত্রের, বিশেষ করে লাহোর শহরের লোকেরা।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডাক্তার।

ডাঃ তমীশ মুখার্জী বাঙালী ক্রিশ্চান। জন্ম লাহোরে। তমীশ মুখার্জীর বাবা সতীশ মুখার্জীও বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তাঁর যত রুগী যত পসার সবই পেয়েছে ডাঃ তমীশ। বাপের মতো মনপ্রাণও পেয়েছে। ক্রিশ্চান পাড়ার সান্দা রোডের বাড়িটা সতীশ মুখার্জীরই তৈরী। এক ছেলে তমীশ, পাঞ্জাবীদের মতো দেখতে। বাঙালী বলে ভুল হয়। মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের মিষ্টি ভাব মাখানো। দেখলেই মন কেড়ে নেয়, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

রুগীরা এই চাব্বশ-পঁচিশ বছরের যুবক ডাক্তারকে 'জিন্দগী' আখ্যা দিয়েছে। প্রাণ—রুগীদের প্রাণ। তমীশকে দেখলে, কথা শুনলে রুগীরা ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়। রোগ ভালো হয়ে যায়।

এ রকম দেবতুল্য ডাক্তার বলেই তার ওপর কারো সন্দেহ নেই। আর সন্দেহ আসতে পারে না বলেই সেও শার্ফুন্নিসার ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন। বছরের পর বছর কেটে গেলেও, হাফিজ কোনোদিনই শার্ফুন্নিসাকে খুঁজতে আসবে না বা লোক পাঠাবে না এখানে। ডাক্তার ভালোভাবেই জানে বলে শার্ফুন্নিসাকে নিশ্চিন্তের আশ্বাস দিতে পেরেছে তাই।

শার্ফুন্নিসা বাড়ি থেকে বেরোয় না মোটে। বারান্দার ধারে পর্যন্ত দাঁড়ায় না। নিজে ধরা পড়তে—ডাক্তারকে বিপদে ফেলতে—বিব্রত করতে চায় না।

ডাক্তারকে যখুনি কিছু বলতে গেছে শার্ফুন্নিসা, ডাক্তার তখুনি পাশ কাটিয়ে চলে গেছে—বলে গেছে হবে'খন।

ডাক্তার তার ভুলেতেই ডুবে থাকতে চায়। ভুল ভাঙলে, পাছে আঘাত পায় এই ভয় সদাসর্বদা।

যে ভুলে স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হয়, আনন্দের স্নিগ্ধজ্যোৎস্না ফুটে ওঠে, সে ভুল ঢের বেশী ভালো—রূঢ় সত্যির চেয়ে। ভুল-সত্যির বিচারকর্তা কে? নেই কেউ। মিছিমিছি ও কচকচানিতে অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কা!

শার্ফুন্নিসা যেন ক্রমেই হাফিজ সাহেবের বেগম কথাটা ভুলতে বসেছে। ডাক্তারকে দেবতার মতো দেখে সে। তার পবিত্র চাউনির স্পর্শে যেন ও নতুন হয়ে জন্ম নেয়। অতীত জীবনে ফিরে যেতে মন চায় না। ডাক্তারকে জানায়, সেবাধর্মে সন্ন্যাসিনী করে নিন আমায়।

ডাক্তার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মুখেচোখে খুশীর আমেজ।

হাফিজ শয্যাশায়ী। ভীষণ জ্বর, আনচান করছে। বিকারের ঘোরে অসংলগ্ন কথা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। শার্ফুন্নিসার মুণ্ডুপাত করছে, বাবুর্চিব মুণ্ডপাত করছে।

নার্স-ডাক্তাররা দিনরাত কাছে কাছে। জ্বরের ধমকে তেড়ে তেড়ে উঠছে কেবল। দিন রাত সমান। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না—কোনো ওষুধই কাজ দিচ্ছে না, কোনো ডাক্তারই রোগ ধরতে পারছে না। সান্দা রোডের ডাঃ তমীশ মুখার্জীকে আনা হল হাফিজকে দেখাতে।

রুগী দেখবে কী, গালে হাত দিয়ে বসে স্তব্ধ কঠিন ডাক্তার।

বিকারের ঘোরে হরদম বক বক করছে হাফিজ। চীৎকার করে বলছে—

পাকড়ো! পাকড়ো। শার্ফুন্নিসা মুঝে ছোরি মারনে আয়ি। খুন! খুন! মেরে বাচ্চে কো ভী!

ডাক্তার অবাক হয়ে যায়।

বিকারের ঘোরেও শার্ফুন্নিসার নাম! মনোবিকার হয়েছে হাফিজের। শার্ফুন্নিসার অভাবটা সহ্য করতে পারছে না মোটে।

শার্ফুন্নিসা বুকে যে দাগা দিয়েছে, সেইটাই রূপ পাল্টে, কল্পনার চোখে—শার্ফুন্নিসা ছুরি হাতে মারতে আসছে। নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে হাফিজ, শার্ফুন্নিসা গর্ভবতী অবস্থায় মারা গেছে—আত্মহত্যা করেছে। তাই ছেলে খুন হওয়ার দৃশ্যটাও ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

আর যাই হোক হাফিজ, লোকে যাই ভাবুক তাকে—খারাপ বদমাশ চোরের সর্দার ডাকাত—কিন্তু তবু সে শার্ফুন্নিসা-পাগল। বলতেই হবে এ কথা।

কার দোষ? শার্ফুন্নিসার, না হাফিজের? হাফিজের পরিণতি তো চোখের সামনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

শার্ফুন্নিসার? অদ্ভুত রহস্যময়ী নারী। এখনো চিনতে পারা যাচ্ছে না তাকে। এমন মালিকের ঘর ছাড়লে কোন দুঃখে? স্বামীর মতো স্বামী, যে স্বামী স্ত্রীর জন্যে উন্মাদ। ভেবে ভেবে মরণের দরজায় এগিয়ে চলেছে—দিন দিন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ধিক্ শার্ফুন্নিসাকে!

আচমকা উঠে পড়ে ডাক্তার।

হাফিজের লোককে বলে দিল—চিন্তা করে দেখি কী করতে পারা যায়।

ডাক্তারের মন-মাথা-দেহ সব বেতাল। কোনো রকমে বাড়ি ফিরে, মানসিক ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিলে।

কৃষ্ণভামিনী উতলা হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করে—শরীর খারাপ না-কি খোকা? তার প্রতিটি কথায় মর্মবেদনা ঝরে পড়ে। ডাক্তার নিরুত্তর। বোবা চাউনি।

কৃষ্ণভামিনীর চোখ ছলছলিয়ে এল। ছেলের মাথার কাছে বসে পড়ল। তার বড় মুখ-চাওয়া ছেলে, ডাক্তার।

ডাক্তারের বুকের ধুকধুকনিতে দুলে দুলে উঠছে আকাশ-পাতাল

চিন্তার ঢেউ। ঢেউ এসে গলায় কথা বেরুবার পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে কেবল। ঠোঁট কেঁপে উঠছে—কিন্তু কথা নেই। কৃষ্ণভামিনী ভয় পেয়ে যায়—একি হল ?

শাফ্‌ন্নিসাকে বুক ভাঙা আওয়াজে ডাক দেয়।

শাফ্‌ন্নিসা তখন যীশুর সামনে দাঁড়িয়ে এক মনে দেখছে—ডাক্তার যীশু হয়ে যাচ্ছে, আবার যীশুই ডাক্তার হচ্ছে। একটা বোবা আনন্দের নাচুনি চলতে লাগল শাফ্‌ন্নিসার সারা শরীরে।

কৃষ্ণভামিনীর কাতর কণ্ঠে স্তব্ধ বিস্ময় ঘিরে ধরে শাফ্‌ন্নিসাকে। —এরকম প্রাণ কাঁদানো ডাক কোনোদিন তো শোনেনি সে। সে জানত এখানে দুঃখু-শোকের প্রবেশ নিষেধ। একি স্বপ্ন? দেবী কৃষ্ণভামিনী ডাকেন এই ভাবে ?

চলতে গিয়ে পা অবশ হয়ে পড়ে শাফ্‌ন্নিসার। মনের অফুরন্ত ফূর্তি নিমেষে হারিয়ে যায়। একটা অমঙ্গল আশংকায় বুক ঢিব ঢিব করতে থাকে। কোনো রকমে পায়ে পায়ে এসে পৌঁছুলো ঘরে।

ডাক্তারের অবস্থা দেখে হতবাক। শাফ্‌ন্নিসার দুঃস্বপ্নময় জীবন যেন বাঘথাবা নিয়ে হিংস্র নখে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে চাইছে—অসহ্য অস্বস্তি। কৃষ্ণভামিনীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধরে শাফ্‌ন্নিসা। ডাক্তার তখন চোখ বুজেছে। ইশারায় কথা কইতে মানা করলে কৃষ্ণভামিনী !

শাফ্‌ন্নিসা কৃষ্ণভামিনীকে অপলক চোখে দেখছে—মা—বিশ্বের আর সব মা এক হয়ে বসে আছেন কৃষ্ণভামিনী, আর ছেলে—বিশ্বের সব ছেলে এক হয়ে ডাক্তার শুয়ে আছেন তার কোলে। শুধু সে-ই দূরে—অনেক—অনেক দূরে—এ শুদ্ধ সুন্দর আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

কৃষ্ণভামিনী একভাবে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ডাক্তারের মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে। তার শান্ত কোমল আঙুলের স্পর্শে অন্তর্দাহ জুড়িয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘরে ফিরে এলো শাফুন্নিসা। অনুতাপের বৃশ্চিক তাকে কামড়ে কামড়ে বিষে জরজর করে তুলছে—

—কেন এলুম? কেন মলুম না? একি আগুন জ্বালালুম এখানে—স্বর্গ পুরীতে! ডাক্তার যা বলতে চায়, বলতে পারে না হয়তো। গুমরে মরে শুধু। চলে যাব। এবারে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ ফেরাতে পারবে না আর। হাফিজের হাত থেকে বাঁচতে হবে—মরে! ডাক্তারকে বাঁচাতে হবে—মরে। এছাড়া সব অন্ধকার—অন্য পথ নেই। নিজের অগোচরেই, আচমকা 'মা-গো' বলে ডেকে ওঠে শাফুন্নিসা।

পেছনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার। ডাক্তারকে দেখে লজ্জায় বেদনায় নুয়ে পড়ে শাফুন্নিসা। শাফুন্নিসার মুখে ব্যথার ছাপ। ডাক্তরের চোখে পড়ে শাফুন্নিসা কেঁদেছে খুব। এখনো চোখের কোণে লালচে আভা। চোখ দুটো ফুলো ফুলো।

—আহা, ওই মধুর মিষ্টি নিখুঁত গোলাপ পাপড়ী একটু টুসাকর আওয়াজে ঝরে পড়বার উপক্রম। এর ভেতর কেমন করে বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে? কোনটা সত্যি? গোলাপ পাপড়ী—এও চোখের সামনে, বিষাক্ত সাপ, তাও চোখের সামনে। কোনটা সত্যি?

—ডাক্তার! কিছু কী বলতে চান, জানতে চান? আমি কী কোনো অশান্তির কারণ হচ্ছি? আমার মনের কোণে মাঝে মাঝে কে যেন তাই বলে। এটা কী সত্যি, না মনের ভুল? বলুন ডাক্তার! শাফুন্নিসার কণ্ঠে আকুতি।

ডাক্তারের মনে উথাল-পাথাল করে ওঠে—শাফুন্নিসার পূর্বের কথা—হাফিজের হাতে আমায় দেবেন না। আমি চলে যাচ্ছি।

—কিছু না, কিচ্ছু না ম্যাডাম! শরীর ভালো তো? বিশ্রাম করুন একটু! বাজে চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না মোটে! হুনহনিয়ে চলে যায় ডাক্তার। শাফুন্নিসা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—কত বড় ডাক্তার! কত ভালো, কত আত্মভোলা!

চোখে ঘুম নামে শাফু্ন্নিসার। ঘুমের ঘোরে দেখছে—ডাক্তার দাঁড়িয়ে। পেছনে ছুরি নিয়ে দৌড়ে আসছে হাফিজ।

—না, না। হাফিজ, ওঁকে মেরো না! আমায় মারো! আমায় মারো!—চীৎকার করে কেঁদে ওঠে শাফু্ন্নিসা। পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে কৃষ্ণভামিনী। শাফু্ন্নিসাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙায়।

—কা যে দুঃস্বপ্ন! শাফু্ন্নিসার বুক ধড়ফড় করতে থাকে।

কৃষ্ণভামিনী সাহস দেয়—ভয় কী? আমি আছি, তমীশ আছে।

মায়ের কাছে ছেলের বিপদ, তাও আবার মৃত্যুর সামিল বিপদ। শিউরে ওঠে শাফু্ন্নিসা—না, সে কিছুতেই বলতে পারবে না—স্বপ্নের কথা।

—মা, ঘুমুতে যান! বড্ড কষ্ট দি আপনাদের।

কৃষ্ণভামিনী দরদী গলায় বলে—পাগলী কোথাকার! মায়ের কাছে কী ছেলে-মেয়ের দেওয়া কোনো কষ্টই কষ্ট মনে হয়! ঘুমোও দিকিনি! শাফু্ন্নিসার কানে হাত চাপড়াতে থাকে কৃষ্ণভামিনী—ছোট ছেলে মেয়েদের ঘুম পাড়ানোর ভঙ্গীতে।

হাফিজের লোক এসেছে ডাক্তারের কাছে। ভেবে চিন্তে কী ঠিক করলে ডাক্তার, তাই জানতে। বড্ড বাড়াবাড়ি হাফিজের।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন?

যে রকম দেখে এসেছেন হুজুর! খালি মুখে শাফু্ন্নিসা, শাফু্ন্নিসা। বলছেন—শাফু্ন্নিসা, আমি তোমার কাছে যাব। আর কোনো অত্যাচার করবো না! গালি দেব না! তোমায় মেরেছি কত!

হুজুর! কাঁদতে কাঁদতে সাহেব প্রায়ই বলছেন—তোমার পেটে লাথি মেরেছিলুম। রক্তস্রাব হতে আরম্ভ হল। তুমি কিছু বলনি,

প্রতিবাদ করনি—মুখ বুজে নির্বিবাদে সহ্য করেছ। তাই কী চির-দিনের মতো প্রতিশোধ নিলে! ছেড়ে চলে গেলে।

সব শুনে, গম্ভীর গলায় লোকটিকে বললে ডাক্তার—আচ্ছা, কাল একবার এসো?

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে ডাক্তার—ম্যাডামকে বলতে হবে—ফিরে যান হাফিজের ঘরে। গেলে, হাফিজের রোগ সেরে যাবে। হাফিজ বাঁচবে। আর উৎপীড়ন করবে না হাফিজ—অনুশোচনা এসেছে। এই সুযোগ হাফিজকে সংশোধন করবার। ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে—হ্যাঁ, দায়ী হাফিজ। মায়ের প্রাণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ঠিক কথা। কিন্তু ভুলের ক্ষমা হওয়া উচিত—অনুতাপেই সব শেষ। ও লর্ড! ফরগিভ হাফিজ, ফরগিভ ম্যাডাম!

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে কৃষ্ণভামিনী। শার্ফুন্নিসা জড়িয়ে ধরে আদর করছে। সে যেন কৃষ্ণভামিনীর মধ্যে ডাক্তারের সকল অস্তিত্বকে আঁকড়ে ধরছে। ডাক্তারের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে হারিয়ে ফেলছে।

ম্যাডাম!—বিরক্তি-আদেশ মেশানো গলা ডাক্তারের। চমকে ওঠে শার্ফুন্নিসা। সুখের ধ্যান ভেঙে খান-খান হয়ে যায়। শার্ফুন্নিসা কী তার দেবতার কণ্ঠ শুনছে, না আর কারো?

চোখ রগড়ে ভালো করে দেখে নেয়।—না, সত্যি ডাক্তার সামনে দাড়িয়ে!

ছেলের উত্তেজিত ভাব কখনো দেখেনি কৃষ্ণভামিনী। এটা তার চোখেও কেমন যেন নতুন নতুন ঠেকলো। কৃষ্ণভামিনী হতভম্ব। কিছুই বুঝতে পারছে না, কী ব্যাপার!

বলুন! জড়ানো কথায় বললে শার্ফুন্নিসা।

আপনার স্বামী মর মর। আমি দেখতে গেছলুম। আপনার যাওয়া উচিত—অন্তত তাকে বাঁচাবার জন্যে। অতীত ভুলে যেতে হবে। যীশু আপনাদের দুজনকেই ক্ষমা করুন!

আকাশ থেকে পাতালে পড়লো শার্ফুন্নিসা। দৃঢ় কণ্ঠ—না, যাব না। এ আদেশ করবেন না। রাখতে পারব না। তার মুখ দেখতে চাইনে—সে পাপী।

ডাক্তারের কণ্ঠের দৃঢ়তাও বেড়ে উঠল—নেশার খেয়ালে মানুষ ভুল করে, সেটা ভুলই কেবল, পাপ নয়। পাপ-পুণ্য বিচারের মালিক আপনি-আমি নই।

ডাক্তারের অনমনীয় ব্যবহারে একেবারে ভেঙে পড়ে শার্ফুন্নিসা। —কী করবে, কোথায় যাবে ? ঠিক আছে—আজ রাতে ৺। অভিমান-ক্ষুব্ধ মন নিয়ে সারাদিন হাহকারে কাটলো শার্ফুন্নিসার।

কৃষ্ণভামিনী বুঝিয়ে বললে শার্ফুন্নিসাকে—শীরী ! ফিরে যাও স্বামীর ঘরে—স্বামী যখন চাইছে তোমায়। স্বামী আমায় চেয়েছিলেন বলে, মরতে গিয়েও আমার মরা হয়নি। ওঁর সঙ্গে চলে আসতে হয়েছিল পাঞ্জাবে। সে আজ চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে, তখন খোকা পেটে।

কৃষ্ণভামিনীর কথার একবর্ণও কানে ঢুকলো না শার্ফুন্নিসার। সে ভেবেই চলেছে—

—ডাক্তার দেবতা। ডাক্তার তাকে নিজে হাতে তুলে দিন, সে বরং ভালো হাফিজের বাড়ি পাঠানো থেকে। হাসি মনে বিষ খেয়ে মরবে। এ মৃত্যু তার আনন্দের হবে।

—কী ভাবছো এত শীরী ? কৃষ্ণভামিনীর উদ্বেগ-মেশানো গলা —যদি শোনো আমার জীবনের লাঞ্ছনা, সে তুলনায় তোমার মালিকের পীড়ন কিছুই নয় হয়তো। স্বামী তোমাকে ভালোবাসে। তোমার জন্যে পাগল। মরণের পথে। তোমার তমীশের কথা শোনা উচিত। তুমি চলে গেলে আমাদের কষ্ট হবে খুব। কিন্তু, তবু আমরা চাই তুমি সুখী হও।

—কী বলছে মা। যে সুখ পেয়েছে শার্ফুন্নিসা এখানে, সে সুখ সে কোথাও পায়নি। কখনো পাবেও না আর। সে সুখ সইলো

না বরাতে। এমনি হাফিজের কুসঙ্গ বিধাতার অভিশাপ তার ওপর।

—এবারে একটু বুঝছো তো মা? স্নেহ গলে গলে পড়তে লাগল কৃষ্ণভামিনীর কথায়—

—তমীশের বাবা, আমার দাদার বন্ধু ছিলেন। আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসতেন প্রায়। তিনি দেবতা। তমীশের মতোই। আমাদের বিয়ে হল। তিনিই ভেতর থেকে ঘটক লাগিয়ে দু'পক্ষের মত করিয়ে বিয়ে করলেন। আমরা দুজনে খুব সুখী হলুম এতে। আমাদের মা বাপদের চেয়েও।

গোল বাধালো আমার মেজননদ। আমাকে সাজাতে গিয়ে আমার পাঁচ মাসের মা হবার চিহ্ন তার লক্ষ্যে পড়ে। শাশুড়ীর কানে কথা গেল। বাড়িসুদ্ধ থমথমে ভাব। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি—মুখ দেখাতে পারছিনে কারো কাছে। শাশুড়ী কথাটা ওঁর কানে তুললেন। উনি স্বীকার করলেন ওঁরই সন্তান আমার গর্ভে।

তবু হাঙ্গামা মিটলো না। বংশ মর্যাদা হানি হবে। বিয়ের পাঁচ মাস পর ছেলে, একথা লোকত-ধর্মত কী বলবে? কার ছেলে—সমাজ আছে তো। আভিজাত্য বনেদী ঘর তার ওপর।

ওঁকে বাঁচাতে পুকুরে ডুব দিলুম। মরণ হল না। উনি আমার হাবভাব, মনের কথা আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন বোধ হয়। তাই টকে টকে থাকতেন। কখন কী করে বসি। ডুবে মরা আর হল না। উনি তুলে বাঁচালেন। ক্রীশ্চান হলুম আমরা: সটান পাঞ্জাবে আমায় নিয়ে চলে এলেন। দেশে ফেরবার নাম করেননি মরবার সময়েও। আমিও তাঁর জন্যে দেশঘর, সবকিছু চির জীবনের মতো ভুলেছিলুম—বিসর্জন দিয়েছিলুম। ভুলেই গেছি এখন সব —আত্মীয় স্বজনদেরও।

শার্ফুন্নিসার বিস্ফারিত চোখ।

—কী বলছেন মা! তাঁর দেহতুল্য স্বামী আর দেবদূত ছেলের

সঙ্গে হাফিজ! হাফিজের রক্তের কোনো ছেলেরই তুলনা হতে পারে নাকি? ঘৃণায় কপাল কুঁচকে ওঠে শার্ফুন্নিসার। ঘৃণাভরে তাচ্ছিল্যের সুরে বলে ওঠে—না মা! আদেশ করবেন না—অনুরোধ! আমি চলে যাব। কিন্তু হাফিজের কাছে না। সে পশু…।

হু'কানে আঙুল দিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কৃষ্ণভামিনী। শার্ফুন্নিসা অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথা ক'টা। মা আঘাত পেয়েছেন নিশ্চয়। আহা! সাক্ষাৎ দেবী। ওরকম স্ত্রীলোক হয় না। একটা জমা ব্যথার দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে শার্ফুন্নিসার বুক থেকে।

ডাক্তারের ঘরে যাবে শার্ফুন্নিসা। শেষ দেখা—বিদায়। নিশীথ রজনীর বুকের ওপর দিয়ে আবার শার্ফুন্নিসার যাত্রা শুরু হবে—নতুন করে অজানা পথে। অন্ধকারে কালো বোরখা নিয়ে যাবে তাকে। এই কালো বোরখাই এনেছিল একদিন ডাক্তার তমীশ মুখার্জীর বাড়িতে। আবার সেই কালো বোরখাই নিয়ে যাবে ডাক্তারের বাড়ি থেকে।

শার্ফুন্নিসা উঠে দাঁড়াল। আনলা থেকে টেনে নামালো বোরখা। বোরখাকে হাতে নিয়ে চুমু খেল। বিষণ্ণের হাসি হাসল।—কে আছে তার—কেউ নেই। ছায়ামূর্তিরা দূরে—বহু দূরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাদের ঘন ঘন নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছে শার্ফুন্নিসা। চোখের সামনে রক্তের ঢেউ বয়ে চলেছে। হাফিজের কণ্ঠ শুনছে—শয়তানী এবারে যাবে কোথায়? অন্ধকার—অন্ধকার—চারধার অন্ধকার। তলিয়ে যাচ্ছে—মিলিয়ে যাচ্ছে শার্ফুন্নিসা—হাফিজের নাদিরা বেগম—আনারকলি। ধড়াস করে পড়ে যাওয়ার আওয়াজে, দৌড়ে এসে দেখে কৃষ্ণভামিনী, শার্ফুন্নিসা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

রাত বারোটা।

ছটফট করছে। ঘন ঘন পায়চারি করছে ডাক্তার।

—কেন যেতে চান না ম্যাডাম হাফিজের কাছে? কেন চলে যেতে চান অন্য জায়গায়? সব খুলে বলেন না কেন? একটুও কী ওর মায়া হয় না আমাদের ওপর? ওঁকে ছেড়ে যে কত কষ্ট হবে আমাদের, তা উনি জানেন না। আমরা কী চাই উনি চলে যান। কিন্তু কেমন করে রাখা যায়—একজনদের সুখের জন্যে অন্যেরা মরুক, এ অসম্ভব। তা বলে একথাও ঠিক, ম্যাডামের অসুস্থ আবস্থায় ছেড়ে দিতে পারা যায় না কোনো মতেই। ম্যাডামকে চলে যেতে বলাটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে। ম্যাডাম খুবই আঘাত পেয়েছেন।

ডাক্তার শাফুন্নিসার ঘরে এলো অপরাধীর মতো। জিজ্ঞেস করলে —কেমন আছেন ম্যাডাম?

শাফুন্নিসা উদাস দৃষ্টি তুলে ধরলো ডাক্তারের চোখে—

—এখন ভালো ডাক্তার।

—এখানে আপনি যত দিন ইচ্ছে থাকুন! যেতে হবে না হাফিজের কাছে। আগের ব্যাপারটার জন্যে ক্ষমা করুন!

সমস্ত শরীরটা একটা সুখানুভূতির শিহরণে কেঁপে উঠলো শাফুন্নিসার। ঠোঁটের কোণে নিরুদ্বিগ্নের হাসি।

—ঈশ্বর বাঁচাও! আমাকে বাঁচতে দাও! একটু আগে চেয়েছিলুম মৃত্যুকে, ক্ষমা কর প্রভু আমার ভুলকে! কপালে জোড়াহাত ঠেকালো শাফুন্নিসা।

হাফিজ এখন ভালোর দিকে। জ্বর ছেড়েছে। খোসামুদেদের মুখে শোনা শাফুন্নিসা আর বাবুর্চি দুজনেই ডুবে মরেছে। সাহাদ্রার দিকে ইরাবতীর জলে।

চিনলে কী করে শার্ফুন্নিসাকে ? দুজনেই ফুলে ঢোল—বিকৃত অবস্থা। চেনবার উপায় নেই। তবে ওরা ছাড়া মাণিক জোড়ে কে আর মরতে যাবে ? কার এত মাথা ব্যথা ? ওরা ভালো রকমই জানতো হাফিজের হাত থেকে ওদের নিস্তার নেই। বাধ্য হয়ে ডুবে মরতে হয়েছে দুজনকে। ওসব প্রেমের ফল শেষ পর্যন্ত এই-ই।

হাফিজ সব শুনে, পেট নাচিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। পীরের দরবারে সিন্নি চড়ালে। আপসোস করে বললে—সেলিমের আনারকলিকে রাখতে পারলুম না ধরে। সেলিম—জাহাঙ্গীর তাকে টেনে নিয়ে গেল ভূত হয়ে—তার সাহাদ্রায় কবরের কাছে। তা না হলে ওখানকার ইরাবতীতে মরতে যাবে কেন ?

এই সত্য মনে মনে উপলব্ধি করতে পেরেছে হাফিজ। তাই তার শোক দুঃখ-অনুতাপ সব ধুয়ে মুছে গেছে অন্তর থেকে। শার্ফুন্নিসা বেগম তার কাছে মৃতা।

সব কথা যখন ডাক্তারের কানে এল, ডাক্তার ভ্যাব-চ্যাকা খেয়ে গেল।—এসব কী কাণ্ড !—তবে সে কী ভুল করে শীরীকে শার্ফুন্নিসা ভেবে হাফিজের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল ? ছিঃ জোর করলে কী অন্যায় না হত ! আপসোসের আর সীমা থাকত না। প্রভুই বাঁচিয়ে দিয়েছে।

—ও লর্ড, ফরগিভ মি !

শার্ফুন্নিসা মনে মনে নমস্কার করতে।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! শার্ফুন্নিসা মরেছে হাফিজের মনো-রাজ্যে। বেঁচে রইল খালি শীরী—ডাক্তারের শীরী—হাফিজের শার্ফুন্নিসা নয়।

চাঁদনী রাত। ডাক্তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তার চোখে ভেসে উঠছে—শীরী কে ? শীরী কী কুমারী, সধবা না বিধবা ? কিছুই পরিচয় জানা গেল না। পরিচয় নিতে গেলে পস্তাতে হয়। শীরী কাঁদেন—নয় চলে যেতে চান—শেষ পর্যন্ত বেহুঁশ।

পরিচয়েরই বা কী আছে? পরিচয়—পৃথিবীর নারী উনি, স্ত্রী উনি, উনিও জননী।

হয়তো পা পিছলে গেছলেন কারো সঙ্গে। তার ফল ওঁকে ভুগতে হয়েছিলো। সেই লজ্জাজনক ব্যাপার বলতে চান না আজো। ওঁকে এ ব্যাপারে খোঁচা না দেওয়াই ভালো। হাফিজ ওঁর গোপন হদিশ-টদিশ কিছু জানে বোধহয়, তাই শীরী হাফিজের নাম শুনলেই ভয় পান। অস্থির হয়ে পড়েন।

আনমনা ডাক্তার শার্ফুন্নিসার ঘরের কাছে এসে, চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ম্যাডামের এত মিষ্টি গলা! যেন কোকিল কণ্ঠ! তন্ময় হয়ে রেলিং ধরে শুনছে ডাক্তার। শার্ফুন্নিসা তার দরদী গলায় গেয়ে যাচ্ছে। গানের সুরে ভাষায় অন্তরের নিবিড় আবেদন। নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে শার্ফুন্নিসা। ডাক্তার ভাবে ম্যাডামের এ আত্ম-সমর্পণ কাকে? কে সে ভাগ্যবান? খুশী উপচে পড়ে চোখের কোণায় ডাক্তারের।

—আহা! ম্যাডাম বড় ভালো!

ডাক্তারের কানে ঘুরে ফিরে ধাক্কা দিচ্ছে শার্ফুন্নিসার গানের কলি—'তুহান্নু ম্যাঁয় কদে ন ভুল সকদি··· ··· ···

ওগো তোমায় কখনো কী
ভুলতে পারি!
জীবন-মরণ সাথী
কেমনে ছাড়ি?
অন্তর দেবতা, শুনেছ কী বারতা?
মোর প্রেম, মোর ব্যথা, জেনেছো কী মোর কথা?
সুন্দরতম-প্রিয়তম, হৃদয়ের স্মৃতি মম
নিয়না কাড়ি!

গান থেমে গেছে। ডাক্তারের খেয়াল নেই। গানের মায়াজালে

আটকে পড়েছে ডাক্তার। সুরের রেশ তাকে পাক দিয়ে দিয়ে বাঁধছে কেবল। সে আবেশ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কাটিয়ে উঠতে চায়ও না—ডুবে যেতে চায়—নিজেকে ভুলে যেতে চায়।

ডাক্তার!

সম্বিৎ ফিরে পায় ডাক্তার। শাফ্রুন্নিসাকে দেখে থতমত খেয়ে যায়। আমতা আমতা করতে থাকে ডাক্তার—যেন কত অন্যায় করেছে—চুরি করে গান শুনে। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠছে। কপাল ঘামছে।

সহজ করে নিলে শাফ্রুন্নিসা।

আসুন! আজ আর ঘুমুতে মন চাইছে না, খালি গান আর গান, গানের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শাফ্রুন্নিসা ডাক্তারের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো পিয়ানোর কাছে।

ডাক্তার! আপনি একটি গান করুন এবার! আমি শুনি। উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে। গোবেচারা ডাক্তার আর কী করে, বাধ্য হয়ে শাফ্রুন্নিসার পেড়াপীড়িতে পিয়ানোয় হাত ঠেকালো।

সুফীগুরু জালাদ্দিন রুমীর পার্শী কোরাণ মশনবীর ছন্দ বেরিয়ে আসতে লাগল ডাক্তারের ভাব-গম্ভীর মিঠে গলা থেকে পিয়ানোর সুরে সুর মিলিয়ে—

নিস্ত ওয়াশ বাশদ খিয়াল, অন্দর জাহান।
তূ জাহান-রা বরখিয়াল বিন রওয়ান॥
বর খিয়ালে সোলেহ শান ও জংগ এ শান।
বর খিয়ালে নাম-এ শান, ও নংগ এ শান॥

ছন্দের প্রতিটি কথা শাফ্রুন্নিসার হৃদয়ের পরতে পরতে বসে গেল।—কল্পনাকে মানুষ মিথ্যে ভাবে, কিন্তু তা নয়। কল্পনার শক্তিতে জগত চলছে। কল্পনা এত শক্তি ধরে যে, মিলন-যুদ্ধ সব কিছুই ঘটাতে পারে।

আচ্ছন্ন শার্ফুন্নিসাকে শুতে বলে, ডাক্তার চলে যায় শোবার ঘরে।

শার্ফুন্নিসা সারারাত ডাক্তারের গানের কলি কটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। মনের গলায় সুর ভেঁজে ভেঁজে স্মৃতির পরদায় এঁকে চলে।

প্রতি রাতে ডাক্তার উদগ্রীব হয়ে থাকে শার্ফুন্নিসার গানের কথা সুরের ঝংকার শোনবার জন্যে।

শার্ফুন্নিসার ঠিক তাই অবস্থা—ডাক্তারের গানের জন্যে।

কৃষ্ণভামিনী কথা তুললো শার্ফুন্নিসার কাছে—বেটি শীরী! তোমার কী কোনো আপত্তি আছে? আপত্তি কথাটা বুঝতে বাকি থাকে না শার্ফুন্নিসার। সরমে মরে যায়। মুখ নীচু করে বসে থাকে।

কৃষ্ণভামিনীর চোখে তৃপ্তির ঝলক।

হাফিজ নাকি আবার বিয়ে করেছে। শয়দা এসে খবর দিয়ে গেল ডাক্তারকে।

ডাক্তারের সঙ্গে কথায় কথায় হাফিজের বিয়ের খবর জানতে পেরে, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠে শার্ফুন্নিসা। একটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

নিজের অজান্তেই বলে ফেললে শার্ফুন্নিসা—আমার মতো কার এমন পোড়া নসিব হল।

ডাক্তার বিস্ময় বিমূঢ়।

—তবে কি শার্ফুন্নিসা মরেনি? যে মরেছে, সে অন্য কেউ? বাবুর্চি শার্ফুন্নিসাকে পথে ছেড়ে পালিয়েছিল হয়তো। হাফিজের ভয়ে লাহোরে আর ফেরেনি। এধারে শার্ফুন্নিসার কোনো পাত্তা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিল হাফিজ। হাফিজের খুশামোদেরা

একটা যা তা রটিয়ে মজা করেছে। হাফিজের পয়সা লুটেছে। পয়সা যাক, কিন্তু হাফিজ যে পাগল হয়ে মরণের দরজা থেকে ফিরে এসেছে, এটা তাদেরই কেরামতিতে।

শাফুর্ন্নিসার ভাবগতিকে কথাবার্তায় ডাক্তারের নির্বিকার মুখে ভেসে ওঠে দুর্ভাবনার রেখার সারি।

—কাকে চায়, কী চায় ম্যাডাম? ম্যাডামের হেঁয়ালিপনা আর ভালো লাগে না। পরিষ্কার জেনে নিতে হবে। তিনি যা চান তাঁর ভালোর জন্যে, সেই রকমই ব্যবস্থা করা যাবে।

কৃষ্ণভামিনী বলেছে আপত্তি আছে কী?

আপত্তি কী থাকতে পারে শাফুর্ন্নিসার? ডাক্তার দেবতা! তাঁর করুণা অসীম। অকৃপণ স্নেহ। নির্বিচারে ক্ষমা কী ভোলবার, না ভোলা যায়! যে এ সবের স্বাদ পেয়েছে, সে কখনো এ স্বাদ ছাড়তে চায়? জীবন থাকতে নয়।

শাফুর্ন্নিসার দু'চোখের জল ছাপিয়ে ওঠে। চাপতে গিয়ে চোখ বোজে। গড়িয়ে পড়ে দরদর করে বাধা না-মানা চোখের জল।

—ডাক্তার ব্যথা পাবে, খুব ব্যথা পাবে চলে গেলে। এছাড়া উপায় কী? ডাক্তার ভালোবাসে। নির্ভেজাল ভালোবাসা। নীরব বোবা ভালোবাসা, যে ভালোবাসা নিজেকে বিলিয়েই দেয় শুধু, কোনো প্রত্যাশা করে না।

—প্রদীপের সলতের মতো নিজে পুড়ে পুড়ে শেষ হয়, তবু অপরকে আলো দিয়ে যায়।

শাফুর্ন্নিসা দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ডুকরে কেঁদে ওঠে বালিসে মুখ গুঁজে। মনে হতে লাগল ডাক্তারের পা দুটো জড়িয়ে ধরে, আর চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে মুখ ঘষে ঘষে।

দরজায় টোকার আওয়াজ।—একি! কোথায় ডাক্তার! ধড়-মড়িয়ে উঠে পড়ে শাফুর্ন্নিসা। নিজের অবিন্যস্ত কাপড়-চোপড় ঠিক করে নেয়। চোখের জল মুছে দরজা খোলে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে।

ভেতরে আসুন ! ভেজা গলা শার্ফুন্নিসার।

ডাক্তারের মুখ চোখ লাল। কান মাথা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। কথাতে বেশ ঝাঁঝ।

কোনো কোনো কথা আপনাকে বেশ পরিষ্কার বলতে হবে ম্যাডাম ! আশা করি সঠিক উত্তরই পাব আপনার কাছে। ধাঁধায় ফেলবেন না !

থর-থরিয়ে কেঁপে ওঠে শার্ফুন্নিসা। চাপা কান্নার দমকে দাঁড়াতে পারে না। বসে পড়ে। রুদ্ধ কণ্ঠ। বোবা বেদনা গুমরোতে থাকে বুকের ভেতর।

অতি কষ্টে, প্রকৃতিস্থ হয়ে থেমে থেমে বলতে থাকে শার্ফুন্নিসা— যা জিজ্ঞেসা করবেন, সঠিক জবাব পাবেন।

—বলতে আমার লজ্জা করে ম্যাডাম ! মুখে বাধে তবু আপনার ভাবি বলে—কী যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে আমার তা জানেন না। তাই···

—আপনি বলুন ! আমি কিচ্ছু মনে করবো না। আমি নিজেই বলি বলি করে পারিনি। এখন আমিও স্থির করেছি, সব বলে চলে যাব।

ডাক্তারের চোখে যেন ধোঁয়ার কুয়াশা। ধপ করে বসে পড়লো। একটু সামলে নিলে নিজেকে।

—না, চলে যাবার কথা নয়। আপনাকে যেতে হবে না। এখানেই থাকুন ! আমি নানারকম শুনে শুনে কেমন যেন হয়ে যাই। আপনার ওপর অন্যায় মনোভাব পোষণ করার অধিকার আমার নেই জানি। আমি আমার এ অন্যায়কে ক্ষমা করতে পারছিনে। প্রভু আমায় ক্ষমা করুন ! আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

—আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি ডাক্তার ! ক্ষমার যোগ্য আমি। আপনি নন। আপনি শ্রদ্ধার পাত্র। শার্ফুন্নিসার স্বরে ফুটে ওঠে বিনয়-দৃঢ়তা।

ডাক্তার বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। জিজ্ঞেস করা আর হয় না।

শার্ফুন্নিসার জবাব দেওয়াও হয় না। ভদ্রতা, ব্যথা লাগা ভালো-বাসার ফরাস এই ভাবেই প্রশ্ন-উত্তরকে দিনের পর দিন ঢেকে রাখে।

কৃষ্ণভামিনী শার্ফুন্নিসাকে বলে, ভেবে দেখেছো মা! সেদিনকার কথা! বয়স হয়েছে। আর ক'দিন। তবু দেখে যেতে পারলে শান্তি পেতুম।

শার্ফুন্নিসার চোখ দিয়ে টস টস করে জল ঝরে পড়ছে—মা—আমি—বি···

—বুঝতে পেরেছি বেটি। তাতে কী? কোনো দুঃখু করো না। তুমি যদি রাজী থাক, আমার কোনো অমত নেই। তমীশও আমার সে রকম ছেলে নয় যে আপত্তি করবে। বিধবার বিয়ে খুব চালু ক্রিশ্চান-মুসলমান ধর্মে। এতে ভয় পাবার, লজ্জা পাবার কিছু নেই। ডোণ্ট ওরী মাই বেবী! কৃষ্ণভামিনী শার্ফুন্নিসার পিঠ চাপড়ে, দাড়ি ধরে আদর করে চলে গেল।

শার্ফুন্নিসা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে।

—না ডাক্তারকে সব খুলে বলতেই হবে। এতখানি প্রবঞ্চনা এদের করতে পারা যায় না। ধোঁকা দিতে পারা যায় না। চোখে ধুলো দিতে পারা যায় না। এরা ক্ষমা করলেও ঈশ্বর ক্ষমা করবে না।

ডাক্তার পিয়ানোয় সুর তুলছে—শার্ফুন্নিসার গাওয়া গানের—তুহান্ন্ ম্যাঁয় কদে ন ভুল সকদি···

নিজের কথা বলতে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো শার্ফুন্নিসা। এখন থাক।

শার্ফুন্নিসার হৃৎপিণ্ড দুমড়ে মুচড়ে পাকিয়ে পাকিয়ে টানছে কে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলো।

কৃষ্ণভামিনী কী শুনছে? কানকে বিশ্বাস করবে, না করবে না? না, সত্যিই শুনছে কৃষ্ণভামিনী—এ সুর এ ভাষা যে তার কত পরিচিত, কতবার শোনা। কৃষ্ণভামিনীর বাবার স্মৃতি জেগে উঠছে খালি।

—চান করে গরদের কাপড় পরে, রোজ সকালে সূর্যের দিকে চেয়ে চেয়ে, এই শ্লোকটি পাঠ করত তার বাবা। কৃষ্ণভামিনী ফিরে গেল বাংলা মায়ের কোলে।

তম্ অস্মাকম্ তবস্মসি।

আনন্দে নেচে ওঠে কৃষ্ণভামিনীর সমস্ত শরীর। পাঞ্জাবে এসে অবধি এ শ্লোক ভুলে ছিল। যে পাড়ায় বাস সেখানেও এ ভাষার চলন নেই। আজ যেন পুরনোকে নতুন করে ফিরে পেল।

যবন মেয়ে শার্ফুন্নিসার জবানে ঋগ্বেদের পুণ্যশ্লোক! বেদ গান—প্রার্থনা মন্ত্র—আমি তোমার তুমি আমার! স্বর্গসুখে ভরে ওঠে মন; কৃষ্ণভামিনীর কৌতূহল জাগে—শীরীকে জিজ্ঞেস করতে হবে—কেমন করে জানলে, কার কাছে শিখলে এ প্রার্থনা।

ডাক্তারের বারণ বিছানা থেকে ওঠা। হাইপ্রেসার। বারণ ভুলে গেলো কৃষ্ণভামিনী। দেয়াল ধরে ধরে আসছে শার্ফুন্নিসার ঘরের দিকে।

শার্ফুন্নিসা প্রার্থনা শেষ করে অন্তরের আকুতি জানাচ্ছে তার দেবতাকে।—ত্বমেম মম সর্ব দেব দেব।

কৃষ্ণভামিনীর চোখের সামনে স্নিগ্ধ জ্যোতি ভেসে উঠছে, সমস্ত দেহ অবশ হয়ে আসছে। বাঙলা মায়ের কোলে যেন লুটিয়ে পড়তে চাইছে কৃষ্ণভামিনীর দেহ। কৃষ্ণভামিনী দেখছে—অপূর্ব জ্যোতির মধ্যে তার বাবা বসে' তাকে ডাকছে। দুর্বল দেহের ভার সইতে না

পেরে টলে পড়লো কৃষ্ণভামিনী। সামনে কী যেন আঁকড়ে ধরতে গেলো। শূন্যকে জড়িয়ে ধরলো বুকে চেপে। সজোরে আছড়ে পড়লো করিডরের মেঝেয়।

দৌড়ে এলো শার্ফুন্নিসা, দৌড়ে এলো ডাক্তার। কৃষ্ণভামিনীর জ্ঞান ফেরাতে শত চেষ্টা চললো সারাদিন। কিন্তু জ্ঞান আর ফিরলো না।

ডাক্তার মুষড়ে পড়লো খুব। মা ছাড়া আর কেউ তার তো আপনার জন নেই। শান্ত ডাক্তার, চাপা ডাক্তার কাউকে কোনো দুঃখ প্রকাশ করে না। নিজের ব্যথা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে হাল্‌কা করতে চায় না। নিজের জ্বালায় নিজে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তবু বিষাদের হাসিটি মুখে লেগেই আছে।

শার্ফুন্নিসা নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছে। দিনরাত কান্না। তারই যেন মা মারা গেছে।

শার্ফুন্নিসা যে এদের এতখানি আপনার করে নিয়ে ফেলেছে, তা এতোদিনে স্পষ্ট অনুভব করছে।

চোখের জল মুছে ডাক্তারের কাছে যায় শার্ফুন্নিসা। সান্ত্বনা দেয় ডাক্তারকে। ডাক্তারের বিষণ্ণ মুখ দেখে তার অন্তর হাহাকারে ভরে ওঠে। অবাধ্য চোখের জল নেমে আসে বন্যার প্লাবনে। মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যায়।

কেটে গেল কিছুদিন।

কৃষ্ণভামিনীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রোজ সকাল সন্ধ্যে প্রার্থনা করে ডাক্তার আর শার্ফুন্নিসা। কৃষ্ণভামিনীর অভাবকে এই ভাবে পূরণ করতে চেষ্টা করে ওরা—নিজেদের সান্ত্বনার পথ নিজেরাই খুঁজে-বেছে নেয়।

যেটুকু অভাব-অভিযোগ ডাক্তারের, সব ব্যবস্থা করে রাখে

শাফ্‌ন্নিসা। অন্তত কৃষ্ণভামিনীকে অনুকরণ করে। এ অনুকরণ আন্তরিকতাহীন নয়। অন্তরের টান।

বছর দুয়েক পর।

শ্রাবণ সন্ধ্যা। পিয়ানোয় সুর তুলছে আনমনা ডাক্তার। ঘরে এসে ঢুকলো শাফ্‌ন্নিসা।

—কী হচ্ছে ডাক্তার? সুরটা কানে খটখট করে কেমন লাগছে যে। এবার সুরের দেবীর আরাধনা করুন, না হলে মাথা খুলবে না। পরিহাস ছলে কথাগুলো বললে শাফ্‌ন্নিসা।

ডাক্তার মৃদু হেসে বললে, ম্যাডাম! এ বে-সুরোকে কী সুরে আনতে পারেন না আপনি?···আপনিই তো আমার সেই সুরের দেবী। শেষের কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে। ডাক্তার জিভ কাটে।

শাফ্‌ন্নিসার পা থেকে মাথা অবধি কেঁপে উঠল। একটা বিদ্যুতের চমক খেলে গেল সারা শরীরে।

—শাফ্‌ন্নিসা এ কি করলে! একি ঠাট্টা! এতোখানি গড়িয়ে গেছে, আগে সেও বোঝেনি। ছিঃ, ডাক্তার তার কাছে দেবতা যে, আর সে হচ্ছে একটা বিধবা—পরিচয়-হীন রাস্তা কুড়োনো মেয়ে। এছাড়া নতুন কোনো পরিচয় নেই তার। সব হারিয়ে গেছে, গুলিয়ে গেছে।

ডাক্তারকে সাধারণ মানুষের স্তরে নামতে দিতে পারবে না শাফ্‌ন্নিসা। কখনো না। ডাক্তার বেঁচে থাকবে চিরদিন তার হৃদয়ে—অমর দেবতা হয়ে।

নিঝুম রাত। ভালো করে দেখে নিলে চারধার শাফ্‌ন্নিসা। তার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। পুরনো কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে নিলে। আস্তে পা ফেলে কৃষ্ণভামিনীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

মায়ের ছবিকে প্রণাম করে যাবে। ডাক্তারকে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে। বুকে হাতুড়ি পিঠছে যেন কে। কিন্তু তবু তাকে যেতে হবে—না-জানা ঠিকানায়।

ঘরে ঢুকে হতভম্ব।

ডাক্তার কৃষ্ণভামিনীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলে চলেছে—

—মা! আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি ম্যাডামকে? বল। তোমরাও কী তাই ইচ্ছে ছিলো না?

কী অসহায় জিজ্ঞাসা শিশুর মতো।

আর ভাবতে পারে না শাফুন্নিসা। মাতৃস্নেহে ভরপুর হয়ে ওঠে তার বুক—টইটম্বুর। আবেগ চাপতে পারছে না আর। শাফুন্নিসা যেন কৃষ্ণভামিনী হয়ে গেছে। নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। বোরখা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ছুটে এসে ডাক্তারের জলভরা চোখ নিজের বুকে চেপে ধরল। হু হু করে শাফুন্নিসার চোখের জল ঝরে পড়তে লাগলো ডাক্তারের মাথার ওপর।

ডাক্তার যেন কৃষ্ণভামিনীর বুকের স্পন্দন শুনতে পেলো শাফুন্নিসার বুকে।

—ম্যাডাম, আমায় ছেড়ে চলে যাবেন না!

—না, না ডাক্তার!

শাফুন্নিসা রোজ সকালে বেদগান করে।

ডাক্তারের কানে গেলো—ত্বম্ অস্মাকম্স্মসি। ডাক্তার মন্ত্রমুগ্ধের মতো শাফুন্নিসার ঘরে গিয়ে হাজির। তন্ময় হয়ে শুনছে।

সম্বিৎ ফিরে পায় শাফুন্নিসার পরশে। শাফুন্নিসা প্রণাম করছে। আশ্চর্য হয়ে যায় ডাক্তার।

এতো সুন্দর গান কার কাছে শিখলেন ম্যাডাম?

—বাবার কাছে। কথাটা বলে ফেলেই শার্ফুন্নিসা নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ডাক্তার হকচকিয়ে যায়। শার্ফুন্নিসার মাথায় হাত বুলোতে থাকে। সান্ত্বনা কী দেবে ডাক্তার? কী ব্যাপার সবই তো তার অজানা।

শার্ফুন্নিসা মুখ খুললো নিজেই।

—ডাক্তার! যখুনি মনে পড়ে গাঁয়ের কথা, যখুনি মনে পড়ে বাবার কথা, তখুনিই এই গানটি আমার গলায় ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে আসে কেমন করে, আমি তা জানতে পারি নে। আমায় পাগল করে দেয় ডাক্তার—ওরা সকলে মিলে। আমি দেখতে পাই পজনের রক্তের ঢেউ, মজনুর রক্তের ঢেউ। সেই রক্তের ঢেউয়ে আমি ডুবে যাচ্ছি।

শার্ফুন্নিসাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে; তার কান্না বন্ধ করবার জন্যে, ডাক্তার অন্য কথা পাড়তে চায়।

কিন্তু শার্ফুন্নিসার কানে কোনো কথাই ঢুকছে না। তার স্থির দৃষ্টি অতীতকে টেনে নিয়ে আসছে সামনে।

ডাক্তারের বিস্ময় জাগে, ম্যাডাম কী বলে গেলেন—মজনুর রক্তের ঢেউ, পজনের রক্তের ঢেউ।

শার্ফুন্নিসা বলে চলেছে এক এক করে তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা। প্রত্যেক ছবিটি ডাক্তারের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ডাক্তার উৎকর্ণ হয়ে একমনে শুনে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

লরেন্স গার্ডেন। সিবিয়ার ক্যারব গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রফেসরের ভঙ্গীতে লেকচার ছাড়ছে পজন। মজনু আর কী করে, বাধ্য হয়ে বড় বড় চোখ করে পজনের দিকে চেয়ে আছে।

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, আঙুল নেড়ে নেড়ে পজন বলতে লাগলো—

—তোরা তো গেঁইয়া! কী আছে তোর দেশে? দেখদিকিনি, এখানে কেমন বাগান, মসজিদ, কবর, মন্দির, গুরুদ্বার— সবকটাই ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকা এক একজন মহারথীর তৈরী।

বোকা চাউনির মজনু এরকম গোহারা হারতে রাজী নয়। মাথাটা দুবার ঝাঁকিয়ে নিলে ওপর নীচে।

দেখ পজন! আমাদের দেশে যা আছে, দুনিয়ায় তা নেই। সৈয়দ-পীব যা ভবিষ্যৎবাণী করে গেছলেন শত শত বছর আগে, তা সত্যি হল একদিন। আর কোথায় হল জানিস? আমাদের দেশে— ঝাংগে চন্দ্রভাগার কিনারে।

সেই সত্যিকে যিনি দেহাতি কবিতায় ধরে রাখলেন, তিনিও সন্ন্যাসী-ফকির ওয়ারিস শাহ। তুই কী জানবি তা এসবের?

পাঞ্জাবেব ঘরে ঘরে গাঁ-শহর সর্বত্র—ছেলে বুড়োর কাছে, তাদের মুখে মুখে, ওয়ারিস শাহের হীব-রাংঝা কাহিনী লোকগাথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বুক ফুলিয়ে মজনুকে ঠেলা মারে পজন। সমস্ত দেহ কাঁপিয়ে হেসে ওঠে।

– তাতে কী হয়েছে? তাব কী কোনো বিরাট স্মৃতি-টিতি আছে? দেখাতে পারিস?

নীচু গলায় মজনু বলে—না। তবে মানুষেয় মনে চিরস্থায়ী স্মৃতি হয়ে আছে। আর থাকবেও। এ স্মৃতিমন্দিরকে প্রকৃতির খেয়াল—ঝড় জল রোদ্দুরে খোওয়াতে পারবে না, নষ্ট করতে পারবে না। মানুষের খেয়ালও না।

ধমক দেয় পজন—থাম! রাখ তোর বুড়োরি! পাখীর শুনে শেখা বুলির মতো বড়োদের কাছে শোনা কথা কপচাসনে আর! ন্যাকামী আমার ভালো লাগে না।

অভিমান-ক্ষুব্ধ গলায় মজনু বলে ওঠে—

—আমাদের দেশে সেই হীর আবার এসেছে—জন্মেছে। এবারে হিন্দুর ঘরে।

হাসি চাপতে গিয়ে, পান মুখে বিষম খায় পজন। মজনু মাথা চাপড়াতে থাকে।

একটু সামলে নিয়ে পজন বলে—না ভাই, তোমার শাপমুণ্যি খেয়ে এখুনি মরতে পারবো না। দোহাই, মরণ ফাঁড়া কাটলো; বাপ্‌স্‌! সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্‌শন রি-অ্যাক্‌শন।

রাস্তায় চলতে ফের মজনু বললে—

—পজন! হাসির কথা নয় এটা। সত্যি হীর জন্মেছে। তুই আমাকে ঠাট্টা করিসনে! আমাদের পাশের বাড়ী হীরদের। আমি তাকে দেখেছি। মা-বাবার মুখে শুনেছি বইয়ে পড়া হীরের মতো দেখতে।

হীর-রাংঝার গান যখন গাঁয়ের মেয়েরা ছেলেরা করে, ও ছুটে যায়। তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। নিজে যেন কেমন হয়ে যায়। তাই ওকে হীর বলেই ডাকে সবাই। আসল নাম ওর তুফানী।

—তোর গুলতানি বিশ্বাস করলে তুই থামবি? বল তা হলে হার মানতে রাজী।

—গুলতানি নয় –সত্যিই বলছি। গাঁয়ের লোকে সব জানে। বিরক্ত হয়ে ওঠে পজন।

—ভালা গেঁইয়ার পাল্লায় পড়লুম তো! মাথা নেই, মুণ্ডু নেই—বকর বকর। ওর আজগুবি কথা আমায় মেনে নিতে হবে! আমি ওসব শুনতে রাজী নই, মানতে রাজী নই। সাফ জবাব।

—বিশ্বাস না করিস, চ' আমার সঙ্গে! চোখের সামনে দেখিয়ে দেবো।

—বাজি ফেল!

—বেশ রাজী আছি।

ফোরম্যান ক্রিশ্চান কলেজ তখন বন্ধ।

কলেজ রেসিডেন্সিয়্যাল হোষ্টেলে থেকে থেকে অরুচি ধরেছে মজনুর। ছুটি পেলেই তল্পিতল্পা গুটোয় সঙ্গে সঙ্গে—দেশ-মুখো মন।

পজন আর যাবে কোথায়? সে লাহোর সিটির ছেলে। তার বাপ-দাদারা গাঁয়ের সম্পর্ক ছিঁড়ছে তিন-চার পুরুষ আগে। আনারকলি বাজারে ওদের বাড়ী। বাপ বড়ো শাল মার্চেণ্ট।

বাবাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করালো পজন। বন্ধুর দেশে একটু চেঞ্জ হ'বে তো। আসল উদ্দেশ্য বাজি ফেলা-ফেলি। মজনু-পজনে দুজনে গলায় গলায় ভাব। পজনকে মজনুর সঙ্গে ছেড়ে দিতে রাজী হল বাবা।

মজনুর সমবয়সী পজন। সতেরো কি আঠারো। সেকেণ্ড ইয়ারে দুজনেই পড়ে। ক্লাসের অন্য ছেলেরা মজনুর দেশ দেখতে যাবার জন্যে উদ্যোগী হয়ে উঠলো। পজনের সঙ্গে মজনুর চুক্তি তাই অনুরোধ করে এবারকার মত তাদের যাওয়া বন্ধ করলে মজনু।

দুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি করে গাঁয়ের পথে চলেছে। টাংগা করেনি। সেটা পজনের আপত্তি—বেড়াতে এসে যদি মুক্তভাবে প্রকৃতির সঙ্গে না মিশলুম, তাহলে গাঁয়ে না আসাই ভালো।

সাদাটে মেঠো রাস্তায় চলেছে তো চলেছেই ওরা—রাস্তার দুধারে তফাৎ তফাৎ শাল, ফার, বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, বাবলা, নিম আর ফুল গাছের সারি। শালোয়ার কুর্তি পরে মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নিয়ে দল বেঁধে কুয়োর ধারে আসছে মেয়েরা। মুটিয়ার-কুড়ি—যুবতী, কুমারী, দড়ি টেনে টেনে চড়খড়ি ঘোরাচ্ছে। জল তুলছে। ঘড়া ভরছে। এ ওর দিকে চেয়ে মুচকে হেসে চলে যাচ্ছে। কেউ বা স্বামী পুত্রের কথা কইচে পা ছড়িয়ে বসে বসে।

ঘানিতে জোড়া গরুর মত কুয়োয় জোড়া গরু ঘুরে ঘুর হলট্ চালাচ্ছে—জল তুলছে। কুয়োর জল চোংগা দিয়ে যাচ্ছে। চৌবাচ্চা

ভর্তি হচ্ছে। অনেকে সেই জলে চান করছে। গরু বাছুরকে খাওয়াচ্ছে। চৌবাচ্চার জল আবার ক্ষেতে চলেছে নালা দিয়ে গড়গড়িয়ে। উট জলের থলি ভরে নিয়ে, গাঁয়ে গাঁয়ে মাল বওয়া-বয়ির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

ছেলেরা বোশেখের সোনালী ফসল গম কাটতে শুরু করে দিয়েছে। কী খুশী তাদের চোখে মুখে উপচে পড়ছে। পাগড়ি বাঁধা পায়জামা-কামিজ পরা চোব্বর-যোয়ানরা মেতে উঠেছে। নাগরা জুতো পায়ে, দল বেঁধে নাচছে। ভাঙরা নাচ। প্রকৃতির বুকে সতেজ সুঠাম অঙ্গের দামাল ছেলেরা, নেচে-কুঁদে গেয়ে, গাঁ গুলজার করে তুলছে। নাচের সঙ্গে বাজনা বাজছে—ঢাক, ঢোল, চিমটে, খরতাল, বাঁশী। চাষীদের—জাটদেরও সেই সঙ্গে প্রাণখোলা বলিষ্ঠ গলায় গান চলেছে—

'কেনক নে ফসল পাকিয়া নে।
বাদল মে খুশিয়াঁ বসিয়াঁ নে॥'
পাকা ফসল হাসি মুখে, হল সোনালী।
খুশীতে বাদল সাথে করে মিতালী॥

গাছ গাছালি ফসল মানুষ সব একতালে এক ছন্দে নেচে উঠছে—ফুল-ফল মেঠো গন্ধ ভরা বাতাসের দোলনে। এক সুরে গেয়ে উঠছে—মাঝে মাঝে হরেক রকম পাখীদের ডাকের সুরে সুর মিলিয়ে।

অত বক্তা মানুষ পজন কেমন হয়ে গেছে। শহুরে ছেলে গাঁয়ের ছোঁয়ার নতুন আনন্দে মশগুল। তার চন-মনে ভাব প্রকৃতির নগ্নরূপের কাজে স্তব্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে নেয় খানিক। সবুজের কোলে—ঘাসের বিছানায়।

গাঁয়ের বাড়ি দোতলা একতলা সব গায়ে গায়ে। কাঁচা মাটির ইঁটে মাটি-ভুষির মশলায় গাঁথুনি করা। ছাদে ছাদে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়া আসা চলে।

হাড় কাঁপানো শীতের পীড়নে আর গ্রীষ্মের গা জ্বালানো গরম হাওয়ায়ও বাড়ি ভাঙে না, মচকায় না জমে না, জ্বলে না, এমনই মালমুগুর। পাঞ্জাবী বুড়ো পালোয়ানদের শিরদাঁড়া সিধে করে দাঁড়ানোর কায়দায় দাঁড়িয়ে আছে এক এক টানা বাড়ি। ঘরে ঘরে ছোট ছোট আওয়াজি—উছলে পড়া রোদ হাওয়ার প্রবেশ পথ।

চারিদিক থেকে সবুজ-সজীবের হাতছানি। পজনের চোখে ঘোর লাগে। যে ধারে তাকায় পজন, সেই ধারই তার চোখে কত সুন্দর হয়ে ওঠে। আকাশ-বাতাস জমি মানুষ মানুষের নিঃশ্বাস সবেতেই অফুরন্ত আনন্দ উচ্ছ্বাস। সবেতেই সরলতা পরিপূর্ণ।

ক্ষেতের পাশ দিয়ে দিয়ে চলেছে দুই বন্ধু। দূর থেকে জলতরঙ্গ গলার একটা সুরের রেশ, হাওয়ায় দুলে দুলে ভেসে আসতে লাগলো। ভরদুপুরে ভোরের আবেশ তৈরী করে তুললো।

মজনুকে বললে পজন—কিসের গান, কি ভাষা, কিছুই বুঝতে পারছিনে। কারা গাইছে? কোত্থেকে?

মজনু যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছে এইরকম ভাব। হাসতে হাসতে বললে,

—যার জন্যে আসা, তাকে পাওয়া গেছে বন্ধু। নসীব তোর খুব জোর।

বিদ্রূপের ঢঙে মুচকে হেসে পজন বললে—তোর স্বপ্নের হীর নাকি?

—হ্যাঁ। স্বপ্নের নয়, সত্যি।

—কোথায়, কাউকে দেখা যাচ্ছে না তো?

—বন্ধু, শহুরে চোখে দেখা যায় না, শহুরে ভাষায় বোঝা যায় না। শুধু সুর-গলা শোনা যায়। কাছকে দূর মনে হয়। বুঝলে?

—খুব বলছিস যে! কোথায় কী তার ঠিক নেই। আমাকে কন্‌ভিন্সড্ করবার আগেই খালি সাজেশন্ দিয়ে মন দুর্বল করবি

নাকি ? দেখ, ওসব চালাকি চলবে না আমার কাছে! তবে হ্যাঁ, এটা সত্যি বলবো, ভালো লাগছে তোর দেশটা।

—যাক্, তবু ভালো। দানাদত্যির শিব পুজো!

উৎসুক দুজন চঞ্চল হয়ে ওঠে। চনমনে তাকানি।

—হেঁয়ালি রেখে বল না দোস্ত, গানটা কত দূরে হচ্ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মজনু। মুখে আঙুল। দুজনকে ইশারা করলে। দুজন নির্বাক।

কিন্তু দুজন কতক্ষণ আর চুপ করে থাকে? মজনু টানতে টানতে একটা ঝোপের পেছনে নিয়ে এলো। পজন ভাবে সাপ খোপের কামড়ে না প্রাণ যায় শেষে।

—এ আবার কি! ঝোপের কাছে নিয়ে এলি কেন?

ফিসফিসিয়ে মজনু বললে,

—কথা ক'সনে! এই ফাঁকটায় চোখ রেখে দেখ, ভেতরে কী দেখতে পাস!

পজনের অবাক দৃষ্টি।

এ আবার—! মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিলে মজনু।

—এটা তর্কের জায়গা নয়। এ তোর লরেন্সগার্ডেন নয়। এ হল ভিলেজার্স গার্ডেন। এখানে তর্ক করতে গেলে, তলোয়ারের ঘা খেতে হবে। হুঁশিয়ার! যা বলি, নির্বিবাদে কর, নির্বিচারে শোন্।

আত্মাভিমানী দুজনের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো।

মজনু পিঠে হাত চাপড়ে বললে,

—ওরে, গাঁয়ের গোঁড়ামি যায়নি এখনো, বুঝলি না, এখানে জাত-বেজাত, উঁচু-নীচু, পঞ্চায়েত সবই বজায় আছে।

মেয়ে বড় হলে ভয়ানক সাবধানী হয়ে ওঠে মা-বাপেরা। শহরের মতো, ছেলে-মেয়ের মেলামেশা পছন্দ করে না এরা। খুন করে ফেলতেও দ্বিধা করবে না, যদি এদের সংস্কারে, ইজ্জতে আঘাত পড়েছে ভেবে নেয়। তাই···।

পজন প্রতিবাদ না করে, মজনুর কথা অনুসরণ করলে। ঝোপের ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে লাগলো—বেশ খানিক দূরে বসে, মেয়ে গান গাইছে।

—ও মাহী ঁ রাংঝাটেয়া সাঁইয়া ওয়ে।
খেড়ে ল্যায় চলে মেরি ডোলিয়া ওয়ে॥
ডোলি চড় দেঁয়া মারিয় ঁা হীরচীক ঁা।
ও ম ঁাহী ঁ রাংঝেটেয়া সাঁইয়া ওয়ে॥
এখনো কেন রাংঝা দূরে-আড়ালে।
খেড় ডোলি নিয়ে যায় মোর শশুরালে॥

মজনু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ডাকতে লাগলো পজনকে।

-এই ওঠ! শীগগির শীগগির! কেউ এসে পড়বে যে! কে কার কথা শোনে! দুজন তন্ময়।

পজন দেখছে, দলের মাঝখানের মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। তার গোলাপ রাঙা গাল, ভ্রমর কালো চোখের তারা চিকচিক করছে। মুখ বিষাদে ভরা। কুঁচো চুল এলোমেলো ফুরফুরে হাওয়ায় মুখে-চোখে আছড়ে পড়ছে। দোপাট্টা-ওড়না মাথা থেকে নেমে বুকে আড়াআড়ি আঁকড়ে আছে।

পিঁড়িতে বাবু হয়ে বসলো মেয়েটি। পাঁচ-ছ' জনে মিলে পিঁড়েটা তুলে ধরলো। অন্যেরা সঙ্গে গাইতে গাইতে এগিয়ে আসতে লাগলো। মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মাঝে মাঝে একবার করে কাদাভেজা গলায় মিঠে মিহি সুরে গাইছে—

—ও মাহী ঁ রাংঝেটেয়া সাঁইয়া ওয়ে।
খেড়ে ল্যায় চলে মেরি ডোলিয়া ওয়ে॥

সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরা দোয়ার দিচ্ছে—

—খেড়ে ল্যায় চলে মেরি ডোলিয়া ওয়ে।

আবার মজনুর ডাক।

—এই উঠে পড়। আর একটুও দেরী নয়! আচমকা মজনুর একটা ধাক্কা খেয়ে, ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল পজন।

—আঃ! কী করিস তুই।

না বন্ধু, আর নয়। ওসব চোদ্দ-পনেরোর কুমারীদের কোনো কুমারী যদি দেখতে পেয়ে বাড়িতে খবর দেয়—মজনুদা আর একজন ছেলে হাঁ করে আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখছিলো—হুলুস্থুল বেধে যাবে এখুনি। চল! দেখলি তো? ওই পিঁড়েয় বসা মেয়েটিই গাঁয়ের হীর।

—ওই হীর! অত সুন্দর, গাঁয়ে অমন মেয়ে হয়! চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। মনকেও না।

পজন চিপটিনি কেটে বলে,

—ম্যাজিক দেখলি না তো?

—চ'দিকিনি! এত হাঁটাহাঁটি, তার ওপর কথার কচকচানি!

—এখন থাক, কাল আবার বেড়াতে বেরুবো'খন।

পজনের নট নড়ন-চড়ন।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে মেয়ের দল। বুক দুরদুরুনি শুরু হয়ে গেলো মজনুর।

পজন বলে উঠলো—মেয়েটা সত্যিই কাঁদছে রে!

আঃ! আগে তো বলেছিলুম, হীর-রাংঝার গান হলে ও নিজেকে হীর ভেবে নেয়।

একেবারে সত্যি হীর। তাই রাংঝার জন্যে ওর কান্না।

পজন যেন কী দেখছে নিমেষনিহত দৃষ্টিতে। হীরের কান্না-ঝরা চোখ—শিশির লাগা গোলাপের পাপড়ি। পজনের মুগ্ধ চোখ আটকে পড়লো হীরের চোখে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে, চুপি চুপি চাপা গলায় ডেকেই চলেছে মজনু—পজন! পজন!

হঠাৎ হীর পিঁড়ে থেকে লাফিয়ে পড়লো। চীৎকার করে উঠলো

মেয়েরদল। উল্টো দিকে দৌড়তে লাগলো। হীর এক ছুটে পজনের সামনে এসেই হাতটা ধরে সজোরে পাশে টেনে নিয়ে গেলো। আর সেই মুহূর্তে ঠিক পজনের গা ঘেঁষে রক্তচোখো ক্ষ্যাপা মোষটা ফোঁসফোঁসানিতে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ছড়াতে ছড়াতে সিধে ছুটতে লাগলো।

পজন হতবাক। মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিতেও অসমর্থ।

মজনুকে দেখে হীর হেসে বললে—

—মজনুদা, দেশে ফিরলে আজ?

ভীতকণ্ঠে মজনু বললে—

হ্যাঁ হীর। আমার বন্ধু এসেছে দেশ দেখতে। তুই প্রাণে বাঁচালি। শহুরে লোক তো, বন-বাদাড়, ক্ষেত-খামার দেখছে একভাবে। খেয়াল নেই কোনো দিকে। আমারও ওর দিকে লক্ষ্য থাকায় একই অবস্থা। ভাগ্যিস তোর নজর পড়ছিলো—পেছনে সাক্ষাৎ যমদূত আসছে।

হাসির ঝলকে হীরের আলো ঝলমল দাঁতগুলো উঁকি মেরেই লুকিয়ে পড়লো।

পজন বিস্ময় বিমূঢ়।

অপূর্ব ভাবময়ী এই হীর! এখনো সুরমা টানা চোখের ঘন কালো লম্বা পাতাগুলো ভিজে রয়েছে– রাংঝার বিরহ-জ্বালার অন্তর গলা জলে। এদিকে পজনকে নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে রক্ষার তৃপ্তির উচ্ছল হাসি।

একই সঙ্গে জলভরা মেঘে পূর্ণিমার চাঁদ।

মজনুর ডাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো পজন। নিজের অগোচরেই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো—ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাইনে? চিরদিন আমার মনের কোঠায় এই স্মৃতি বেঁচে থাকুক।

সলজ্জ মুখ হীরের। চলার পথে যতবার পেঁছু তাকিয়েছে পজন,

ততবারই গা টিপে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে মজনু। মজনুর মুখে অমাবস্যার অন্ধকার।—না আনলেই ভালো হত পজনকে।

পথের শেষ হয়ে এলো।

এখন নিশ্চয় হীরও ডেরার দিকে আসছে। আবার পেছনে তাকালো পজন। বারে বারে দেখেও চোখের পিয়াসা মিটছে না, খালি বেড়েই চলেছে। পজনের তাকানোয় মজনুর ভীরু-কৌতূহলী চোখও পেছু ফিরলো। অবাক কাণ্ড! হীর সেই জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের প্রতি-মূর্তির মতো—ধীর-স্থির। নির্ণিমেষ নয়নে চেয়ে রয়েছে এই দিকেই!

পজন মজনুকে বললে।

—এখন তো কলেজ খুলতে ঢের দেরী। বাড়িতে চিঠি লিখে দি' না হয়। কী বল? দিনকতক একটু চেঞ্জ হিসেবে থাকলে কেমন হয়? তোর মা-বাবাও তো বারবার বলছেন। তোর কী মত?

—মেহেমান অতিথিকে আদর যত্ন করা, আনন্দ দেয়াই গেরস্থের ধর্ম-কর্তব্য। তোর যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারিস! কিন্তু···

হো-হো করে হেসে ওঠে পজন।

—আরে না, না। তোর কোনো ভয় নেই!

কিন্তু পজনের রোজ জ্বালাতন বেড়েই চললো—ভরতুপুরে বেড়ানো সেই ঝোপের ধারে ধারে।

মজনু বন্ধুকে বুঝিয়েও পারে না। সদাসর্বদা তটস্থ। বিদেয় হলে হয়। অথচ জোর করা তো যায় না। একে বন্ধু, তায় অতিথি।

প্রত্যেক দিন হীরের সঙ্গে পজনের দেখা-সাক্ষাৎ চলতে লাগলো। মজনুর বোন হাসিনা হীরেরই বয়সী। হাসিনার সঙ্গে দেখা করার ছুতোয় রোজ মজনুদের বাড়ি বেড়াতে আসতে লাগলো হীর। হাসিনার সাহায্যেই হীর-পজনের নিভৃত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

মজনু বন্ধুর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে থাকে—একটু সামলে বন্ধু! টপ করে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? জেনে রাখিস, গাঁয়ে কানাঘুসা হতে মোটে দেরী লাগে না। হাওয়া বেয়ে এক কথার দশ রকম ফ্যাকড়া—দশ রকম মানে হয়ে কানাকানি করে বেড়ায় চারদিকে।

বেশ জোরালো গলায় বলে ওঠে পজন—তোর অত ভাবতে হবে না! আমি সব বুঝি।

মজনু বাধা দিয়ে বলে—বুঝিস তো সব! তোর আর কী, চলে যেয়ে নিস্তার। শহব অবধি কে আর ধাওয়া করছে? কিন্তু আমার—

বিরক্ত হয়ে কপাল কুঁচকে পজন বললে—সে ভয় নেই তোর। মুখে চুনকালি পড়বে না। বারবার এক কথা।

পথঘাট জানাশোনা হয়ে গেছে পজনের। গাঁয়ের প্রায় সবার সঙ্গে যথেষ্ট আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এমন কী হীরদের বাড়ির সকলের সঙ্গেও। অবিশ্যি এসব মজনুরই দৌলতে। পজনও স্বীকার করে।

মজনু এতে খুব খুশী। বন্ধুর সুখ্যাতির গর্বে বুক দশ হাত হয়ে ওঠে।

পজন মজনুকে নিরালায় নিয়ে যায়। বলে,

—বাড়িতে গিয়ে সব বলছি, সব ব্যবস্থা করছি। এখানে হীরের মা-বাপকে বলে কয়ে যে কোনো প্রকারে বিয়ের ঠিক কর।

মজনু ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে—

—যাও বা এখনো কেউ বুঝতে পারেনি কিছু, চন্দ্রভাগার নদীর ধারে যাতায়াত—নিরিবিলি জায়গায় প্রণয়—এসব ভেস্তে যাবে এক আছাড়ে। গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে শেষে। আর তোরও চিরজীবনের মতো গাঁয়ে ঢোকা বন্ধ। একটু থেমে মজনু চিন্তা করতে থাকে। পজনের খুশী-খুশী ভাব—মজনু বোধহয় রাজী হয়েছে। মতলব ভাঁজছে।

মজনু বলতে আরম্ভ করলো আবার—

—দরকার নেই ভাই, কিছু বলাবলি। তোর বাবাকে দিয়েই করিয়ে নে। গরীব দোস্তকে আর জড়াস নে মেহেরবানি করে। হুঁশিয়ার! হীরের বাপ আবার গাঁয়ের পঞ্চায়েতের প্রধান—নম্বরদার। খুব বুঝে সুঝে···

লাহোর ফেরবার আগের দিন।

চন্দ্রভাগা নদীর তীরে নৌকো ভিড়লো। দূরে বট গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পজন।

হীর তার সাথীদের নিয়ে নৌকো থেকে নামলো। সাথীরা রয়ে গেলো তীরে। হীর পজনের হাত ধরে নিয়ে চললো নৌকোয়।

চন্দ্রভাগার কাঁচজলে তরতর করে বয়ে চলেছে হীর-পজনের নৌকো।

হীর পজনের বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁদছে হাপুস নয়নে। চোখের জলে পজনের বুকের কামিজ ভিজে উঠছে। পজনের চোখের কোণায় জলের টলমলানি।

ধরা গলায় পজন বললে—

—হীর! কিচ্ছু ভেবো না তুমি! কথা দিচ্ছি আমি, তোমায় বিয়ে করবোই! কেউ রুখতে পারবে না। কারো সাধ্য নেই। আমার অন্তর, আমার মন, আমার প্রাণ-নিঃশ্বাস, প্রত্যেক অঙ্গ তোমার অন্তরে, তোমার মনে, তোমার নিঃশ্বাসে অঙ্গে অঙ্গ মিলে এক হয়ে গেছে। এক হয়ে আছে। কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না কখনো।

হীরের ঠোঁট কেঁপে উঠলো। পজন হাত চাপা দিলে।

—বলতে হবে না তোমায়। আমি কি জানিনে, তোমার কী অবস্থা, কী কষ্ট হচ্ছে? আমার মতো তোমারো। আবার আসছি। শিগগির আসবো। হাসিনাকে দিয়ে চিঠি দিও।

হীরের কণ্ঠে কাতর আকূতি—

—ভয় হয় যদি বিয়ে দিয়ে দেয় বাপুজী! তুমি জানো না পজন! হীরের সংগে রাংঝার বিয়ে হয়নি। হল অন্য লোকের সঙ্গে। সে যে কী অবস্থা! শিউরে ওঠে, অস্থির হয়ে পড়ে হীর।

পজনের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস।

—না, না। কিছুতেই না। তা হতে পারে না। হবেও না। আমি শুনেছি হীর-রাংঝার কাহিনী। তোমাকে আমি প্রাণ থাকতে কারো হাতে যেতে দেবো না! কারো হাতে ছেড়ে দেবো না।

—কিন্তু তুমি জান না, বাবার গোঁ যদি···। তখনো কী তুমি···

—হ্যাঁ হীর। কেন আগে অত অশুভ আশংকা করছো? ধর, যদি সেই অসম্ভব কখনো সম্ভব হয়, তাহলেও আমি কিন্তু তোমার অপেক্ষায় থাকবো সারা জীবন—কখনো যদি ফিরে আসা সম্ভব হয় তোমার—এই আশা আঁকড়ে ধরে। যাক, ও অমঙ্গুলে কথা মুখে না আনাই ভালো।

নৌকো ঘাটে এসে ভিড়লো আবার। জলভরা চোখে নামলে পজন! হীরের সাথীরা তাড়াতাড়ি নৌকোয় উঠে পড়লো। সন্ধ্যা হয় হয়।

পজনের জীবন—প্রাণশক্তি পড়ে রইলো নৌকোয়। নৌকো বয়ে চলেছে চন্দ্রভাগার ধার দিয়ে দিয়ে। হাহাকারভরা মন নিয়ে চলেছো হীর। চন্দ্রভাগার স্রোত বইছে তরতর করে! হীরের চোখের জল ঝরছে দরদর ধারে!

লাহোরে ফিরে এসে মন বসে না পজনের। মজনু মন ঘোরাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভবি ভোলাবার নয়। পজনের দিনরাত হীরের চিন্তা। মজনু ভাবে কী কুক্ষণেই বন্ধুকে নিয়ে গেছলুম। বাজি ফেলে মাথায় বাজ পড়বার উপক্রম হয়েঁ দাঁড়িয়েছে এখন। সামলানো দায়।

মজনু পজনের মাকে সব জানালে—

—পজনকে ফেরাবার ব্যবস্থা না করলে, একটা অনর্থ ঘটে যাবে। হীরেরা ব্রাহ্মণ। ওদের কায়স্থদের সঙ্গে শাদি-বিয়ের চলন নেই—সমাজবিরুদ্ধ, নীতি বিরুদ্ধ। এইবেলা ব্যবস্থা করুন।

পজনের বাপ সব শুনে স্পষ্টভাবে বললে—

—যা অসম্ভব, সেখানে হাত দিতে যাওয়াটা বোকামি। আহাম্মকি করো না বেটা! পরে পস্তাবে। পরেশানি হবে—দুঃখু পাবে ঝুটমুট। তুমি এক ছেলে। সমঝে চলবে!

পজনেব গলায় কাকুতি—

—হীরকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না বাপুজী!

পজনের বাপের অদ্ভুত লাগে সব। একি শুনছে সে? বাধ্য ছেলের অবাধ্য কথা। মাথা-টাথা খারাপ হল নাকি! যাক, জোর জবরদস্তি শাসনে বাগ মানবে না। দড়ি ছিঁড়বে।

সান্ত্বনার সুরে বাবা বললে—

—বেশ, বি-এ-টা পাশ করো, তারপর।

—এখনো দীর্ঘ দু'বছর! এক মুহূর্ত সওয়া যাচ্ছে না হীরের অদেখা। কেমন করে বাবার এ রূঢ় রায় মানা যায়? পজনেব মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাধা কিসের? জাতের? বাবা তো মানে না। হীরের বাবা? সে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে, অনুনয় বিনয় করে রাজী করাবে।

ছুটি পেলেই পজন চলে যায় মজনুদের বাড়িতে বেড়াতে। দেশ বড় ভালো লেগেছে। দেশটাই তাকে বারেবারে টেনে আনে। গাঁয়ের লোকেরা শুনে মহাখুশী—গাঁয়ের সুখ্যাতি এটা—সম্মান এটা। সকলে খুব যত্ন করে পজনকে। মনমরা অসুস্থ হীর সুস্থ হয়ে ওঠে পজনকে দেখে। বিরহকাতর মুখে মিলন পিয়াসী হাসি ফুটে ওঠে।

মাঝে মাঝে আসে যাওয়ায়, পজন গাঁয়েরই ছেলে হয়ে গেছে

এখন। গাঁয়ের লোকেরা পর ভাবতে পারে না তাকে। গাঁয়ের লোকদের বেলায়ও পজনের ঠিক ওই ভাব।

বছর দেড়েক কেটে গেলো।

হীর-পজনের লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেমের ব্যাপারে খুবই সাহায্য করে যাচ্ছে আগাগোড়া হাসিনা। বন্ধুকে ফেরাতে গিয়ে নাকানি চুবানি খেয়ে শেষ পর্যন্ত পজনের দলে ঢলে পড়লো মজনু—আহা! বেচারা পজন! এত ভালোবাসা সব বৃথা যাবে! দুটো প্রাণ নষ্ট হয়ে যাবে? দুজন দুজনকে যখন চায়, তখন এ মিলনে বাধা থাকবে কেন?

দিনের পর দিন হীরের মা-বাপ, গাঁয়ের লোক—সবার চোখে ধুলো দিয়ে চলতে লাগলো হীর-পজন।

মহালয়ার পর। প্রতিপদ।

ঝাংগ শহরের ফাঁকা মাঠটা গমগম করছে— লোকে লোকাবণ্য। রামলীলা যাত্রা। যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ী, কুঁচোকাচা কেউ আর বাকি নেই। একেবারে গাঁকে গাঁ উজাড় করে ঝেঁটিয়ে এসেছে সব।

সন্ধ্যেয় রামলীলা আরম্ভ। তা বিকেল থেকেই লোক সমাগম। জায়গা দখল। সাইকেলে, পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে আসছে সব।

লণ্ঠন, লাঠি, টর্চ, মশাল—এক একজনের হাতে এক একরকম —ফেরবার সময় রাত সাতটা আটটা হলে তখন ও সব দরকারী হয়ে উঠবে।

ছেলেরা আলাদা জোট বেঁধে আসছে। মেয়েরাও। ছেলেতে ছেলেতে গলাগলি। মেয়েতে মেয়েতে ঢলাঢলি। হৈ হুল্লোড়ে।

রোজ সন্ধ্যেয় রামলীলা আরম্ভ হচ্ছে। শেষ হবে দশেরায় বিজয়া

দশমীতে। ছেলেরাই রাম, সীতা, হনুমান—রামায়ণের সব চরিত্রই সাজছে। নেচে গেয়ে অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করছে। আনন্দ দিচ্ছে। রামচন্দ্রের অমর জীবনকে নতুন করে লোকের প্রাণে জাগিয়ে তুলছে প্রতি বছরের এই বিরাট উৎসবটিকে বাঁচিয়ে রেখে। এক একদিন এক একটা পালা হচ্ছে। দশমাতে শেষ করতে হবে। সেই ভাবেই ছক বাঁধা।

নবমী।

ফেরার পথে গাঁয়ের মেয়েদের হাসাহাসি ঢলাঢলি বেড়ে উঠেছে অন্য দিনের চেয়ে—আর নাকি তারা সহ্য করতে পারছে না। রামলীলায় সাজা রাবণের দৌরাত্ম্য। রাবণ সাজছে ঝাংগ-শিয়াল গাঁয়ের একজন হোমড়া-চোমড়ার ছেলে শিওনন্দন।

শিওনন্দন অভিনয় করতে করতে মাতলামো করবে, চিটপটাং হবে রোজ, তবু তাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না কেন? মেয়ের দলের মন বিরক্তি-ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে। দলের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো।—

—আরে, ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা, ! রামা হো ! আ, মেরি মা ! এ আপদ রাবণ মরবে কবে !

পাশের মেয়েটি হি-হি করে হেসে ওঠে—

ভাবছিস্ কেন বহিন্! আর তো কালকের দিনটা ওর পরমায়ু মোটে। বেচারা রে। কপোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি।

তৃতীয় মেয়েটি খনখন করে উঠলো—

—জুত্তি, জুত্তি লাগাতে হয় ওরকম রাবণের মুখে। আবার উচ্ছল হাসির ফোয়ারা ছুটতে লাগলো। পাশের ছেলের দলেরা আড় চোখে চেয়ে, মেয়েদের হাসিতে—হি-হির সঙ্গে হো-হো যোগ করে দিলে।

দশমী।

বিরাট পেল্লায় কাগজের দশ মাথায় বারুদ ভর্তি রাবণ দাঁড়িয়ে

আছে মেলার মাঠে। ছেলে-বুড়ো সবার আনন্দ আর ধরে না। রামজী আজ রাবণ বধ করবেন। দুর্দান্ত রাক্ষস রাবণ আজ মরবে। সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। রামকে যা জ্বালান জ্বালাচ্ছে কদিন ধরে!

মাঠে রামবেশী মানুষ ঢুকলো। কাগজের রাবণের বুকে তীর ছুঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে রাবণের বারুদ ভর্তি দশ মাথায় আগুন লাগলো। দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো প্রতিটি মাথা। মাথার আগুনে সারা দেহ পুড়ে ছাই।

রাবণবধ দেখে গাঁয়ে ফিরছে মেয়েরা। তাদের মুখে একটা নিশ্চিন্তের পরিতৃপ্তি।

একটি মেয়ে কোমর দুলিয়ে, হাত ঘুরিয়ে বলতে লাগলো—

শিওনন্দন মরেছে, তোদের আপদের রাবণ।

অন্যেরা এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো! চীৎকার করে বলে চললো—

—শিওনন্দন মরেছে! রাক্ষসমুখো মরেছে!

পাশে শিওনন্দনের ঠাকুমা ফিরে চলেছে বাড়ি। বুড়ীর কানে আওয়াজ গেলো। বুড়ী লাঠি ঠুকে ঠুকে দোল খাওয়া গলায় চীৎকার করতে লাগলো—

—এ মুটিয়ারে—ডবকা ছুঁড়ীরা! তোদের মুখে আগুন! মুখে আগুন! শিওনন্দন মরবে কেন রে হতচ্ছাড়ীরা!

মেয়েদের মধ্যে থেকে আর একটি মেয়ে বলে উঠলো—

—ও ঠাকুমা, তোমার শিওনন্দনের যে সীতার ওপর অত লোভ, সেটা নজরে পড়লো না তো? ও মুখপোড়া না মলে কী শান্ত হতে পারে?

—কেন লা, তোরা কী সীতা হয়েছিস যে তোদের হাত ধরে টেনেছে শিওনন্দন? ওরকম ছেলে গাঁয়ে নেই একটাও। খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঠাকুমা একটু ঢোঁক গিলে শুকনো গলা ভিজিয়ে নিলে।

মরণ দশা! মরণ দশা! ছোঁড়াগুলোর নজর বলিহারি যাই। রাজপুত্তুরের মতো সোনার চাঁদকে আমার রাম না সাজিয়ে একেবারে রাবণ!

মেয়েরা আরো মজা পায়—বুড়ীর পাতাঝোলা চোখের পিটপিটুনি চাউনি আর থরথরে হাত-পা-র নাচুনি দেখে মুখে ওড়না গোঁজে হাসি চাপতে।

রোগা লিকলিকে মেয়েটি বললে—

—রাবণের ছেরাদ্দে আমাদের খাওয়াতে যেন ভুলো না ঠাকুমা।

—আ মলো যা! যেমন রূপ তেমনি বাক্যি! তোদের ছেরাদ্দে খাই আগে দাঁড়া! তারপর—

—আমাদের ছেরাদ্দ অবধি টিকে থাকবে তো? টেঁশবে না তো?

দূর হারামজাদী সূর্পনখারা! টেঁশবো কেন লা? এমন হাড়-জ্বালানে কথা শুনিনি! মাগো মা! উনি যখন বেঁচে ছিলেন, বলতেন, তুমি আমার ছবির আঁকা সীতে। হুবহু। এখনো তোমাকে কে বলবে ষাটের কোঠায়? উনি মরবার সময় বললেন, সীতে! তোমার রাম চললো। বুড়ীর চোখে জল।

মেয়েরা বুড়িকে ধরে আদর করে, সান্ত্বনা দেয়, চোখ মোছায়, নাক মোছায়। মহা বিব্রত হয়ে পড়ে সবাই। ভয়ে মুখ কাঁচুমাচু।

বুড়ী রাগে উত্তেজনায় শোকে কাঁপতে লাগলো। মেয়েরা ঠাট্টা-মশকরা করতে গিয়ে মহাফাঁপড়ে পড়লো বুড়ীকে নিয়ে।

ঠাকুমা চলতে পারলো না। থপ করে বসে পড়লো মাটিতে—চলাপথে।

মেয়েরাও তাকে ঘিরে বসলো। কেউ পা টেপে, কেউ হাত টেপে। হাসিনা জল আনতে গেলো—বুড়ী মরে না খুনের দায়ী করে যায় সকলকে।

হাসিনার জল আনতে দেরী হচ্ছে দেখে, হীরও ছুটলো জলের জন্যে মেঠাইয়ের দোকানে।

মেঠাইয়ের দোকানে শিওনন্দন বসে আছে। কটা বকাটে ছোকরাকে নিয়ে রাজা, উজীর মারছে, যেখান দিয়ে মেয়েরা যাচ্ছে, তাদের দিকে নেশাডোবা চোখের চাউনি—গিলে ফেলবার উপক্রম।

হীর হাসিনাকে বললে—

—মারি এক থাপ্পড় বদমাশকে। ঢং দেখ না! লাল চোখের চাউনির রকমটা দেখেছিস? লাথি মেরে মুখ ভেঙে দিতে হয়! লোহা পুড়িয়ে চোখ কানা করে দিতে ইচ্ছে করছে। এগিয়ে যেতে থাকে শিওনন্দনের দিকে হীর। হাসিনা পেছন থেকে টেনে ধরে।

—থাম! যাসনে হীর! বদমাশের হাতে বেইজ্জতি হবি শেষে!

—পারা যায় না হাসিনা। ক্ষোভে ফেটে পড়ে হীর। আমাকে দেখলেই শয়তানের মুখ চুলবুলিয়ে ওঠে। শুনছিস তো? ওই শোন, ছ্যাঁচড়া বকাটের গান!

সড়কে সড়কে জান্দিয়াঁ মুটিয়ারে নে।
কাঁটা চুবা তেরে পায়ের—
মাদিয়ে নাড়ে নে।
ওলো ডবকা ছুঁড়ী ঘুরেফিরে
যাসনে ওধারে।
তোর নরম পায়ে ফুটলো কাঁটা
দেখ না আমারে!
আমার বুকটা যে জ্বলে—
ফেলে যাসনে লো চলে।

মেয়েদের সেবা-স্তুতিতে, ক্ষমা চাওয়াতে, সবে ঠাণ্ডা হয়েছে ঠাকুমা। হীর এসে আবার গরম করে দিলে।

—বলি, ও ঠাকুমা! তোমার রাম, আদরের রাম, ভুল করে

রাবণ সাজানো রাম—এখুনি তো হাত-পা ছুঁড়তে আরম্ভ করবে কিছু বললে ?

ঠাকুমার হকচকানি—

—উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধরে তো এলি ! বল না, শুনি কী হয়েছে ! এসো আমার সঙ্গে ! শুনতে পাবে দেখতে পাবে !

বুড়ীকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলো হার আর অন্য মেয়েরা। হীরকে আবার দেখে সুর ভাঁজতে শুরু করে দিলে নেশায় টর শিওনন্দন।

—সড়কে সড়কে··· ।

ঠাকুমা ক্ষেপে উঠলো।

—এই শিওনন্দন, এই ! পাজী কোথাকার। নচ্ছার ! সব মেয়েরা তাই অত চটা।

ঠাকুমা মেয়েদের নিয়ে ফিরে চললো। যেতে যেতে শাসিয়ে গেল শিওনন্দনকে—তার বাপকে এখুনি সব কথা বলছে।

কে-কার কথা শোনে ! তখনো শিওনন্দন গেয়ে চলেছে—কাঁটা চু'বা তেরে পায়ের··· ।

বুড়ী কানে আঙুল দিলে—ছিঃ, বেহায়া !

ঠাকুমা শিওনন্দনেব বাপকে ছেলের বেহায়াপনার কথা সব পাটিপেড়ে বললে। সমস্ত শুনে বাবা শিওনন্দনকে ভর্ৎসনা করেছিলো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলো। ছেলে বাপকে জানিয়ে দিলে, হীরের সঙ্গে তার বিয়ে না হলে সে মারা যাবে—আত্মহত্যা করবে।

শিওনন্দনের বাবা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হীরের বাবা শর্মাজীর কাছে গেল।

—শর্মাজী। শিওনন্দনের সঙ্গে আপনার মেয়ে হীরের সগাই—পাকাদেখা করে রাখতে চাই উপস্থিত। পরে শাদি দেবেন, যখন

সুবিধে বুঝবেন। আমার আপত্তি নেই। শিওনন্দনের মতো ছেলে এ তল্লাটে পাবেন না। বড় ভালো ছেলে।

শর্মাজী চার পাইয়ের ওপর নড়েচড়ে বসলো, বেশ রসিয়ে রসিয়ে বিদ্রূপের ঢঙে বলতে লাগলো—তা বটে, তা বটে। ওরকম লম্পট বদমাশ একটাও এ তল্লাটে নেই বটে! হীরের মুখে সব শুনেছি ওর গুণাগুণ।

শিওনন্দনের বাপের মুখ চুন।

দারুণ অপমানে-ক্ষোভে উঠে পড়লো শিওনন্দনের বাবা।

—ঠিক আছে শর্মাজী! রাম, রাম।

গোঁভরে বাড়ি ফিরে এলো শিওনন্দনের বাবা। অপমানের ঝাল ঝাড়লে ছেলের ওপর গালাগালি করে। ছেলে নির্বিকার। কাকস্য পরিবেদনা।

ন্যাকামি করে, নাকি সুরে শিওনন্দন বললে—বাপুজা! হীরের সঙ্গে শাদি দিলেই ভালো হয়ে যাবো। শুধরে যাবো।

মা এসে শিওনন্দনের বাপের ওপর খড়্গ হস্ত। মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, মরাহাজা ছেলে। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ওই একটা সবে ধন নীলমণি। নেচেকুঁদে বেঁচে থাক। অত বকাবকির কী আছে?

কাঁদতে থাকে মা। বাবা বোঝাতে থাকে—কেঁদোনা, যেমন করেই হোক, ওই মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করবোই ছেলের। তবে আমার নাম। শর্মাজীর এত দেমাক! এত অহংকার! আমায় অপমান!

আদরে গলে পড়ে শিওনন্দন। আহ্লাদে গলায় বলে, বেবেজী—মা, তুমি জলদি শাদির ব্যবস্থা কর!

মা শিওনন্দনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে,

মেরে লাল! চুপ কর, সহ্য কর! ওই হীরের বাপকে পায়ে

ধরতে হবে একদিন। আমার সোনার ছেলে—নিখাদ সোনা, তাকে বলে কিনা খাদ মেশানো! অবাক করলে, শুনতেও কানে বাজ পড়ে!

ভাঙাকুয়োর মাঠ।

বিকেল হব হব! বাবলা গাছটার নীচে পজন বসে। ভাবছে কখন হীর আসবে। হীর আসছে না কেন এখনো! জনচারেক বোরখা পরা মেয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো পজনের দিকে। পজন ভাবে এ আবার কী আপদ! সরে যেতে থাকে।

বোরখা খুলে হাসিনা হেসে উঠলো।

—ভয় পাচ্ছিলে! তোমার হীর আজ আর আসবে না বলে দিয়েছে।

পজন হতাশায় মুষড়ে পড়ে। হাসিনা তেরচা চোখে চায় আর হেসে কুটি কুটি হয়। পজনের গা জ্বালা করে। চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাঝখানের বোরখাপরা মেয়েটি চঞ্চল হয়ে ওঠে, উসখুস করে বারে বারে। পাশের দুজনে তাকে চেপে ধরে থাকে।

হাসিনা হাসতে হাসতে খপ করে পজনের হাত চেপে ধরে। পজন হতভম্ব হাসিনার ব্যবহারে—ছিঃ, এমন ছ্যাবলা হাসিনা!

হাসিনার চোখ নাচতে থাকে।

—বল দিকিনি, এই তিনজনের কোনটি তোমার হীর? যেটিকে বলবে হীর, তাকেই কিন্তু বিয়ে করতে হবে—সে হীর হোক আর না হোক! কোনো ছাড়-ছিড়েন নেই।

পজন মহা ফ্যাসাদে পড়ে। চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখছে খালি। আংটি পরা আঙুলটা বার করে ইঙ্গিত করে মাঝের বোরখা পরিহিতা!

পজন দৌড়ে গিয়ে, হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে মেয়েটিকে। বোরখা খুলে দেয়! ফাঁকা মাঠ মুখর হয়ে ওঠে হাসির ঢেউয়ে।

পজন হীরকে তার অশান্ত বুকে নিবিড় করে চেপে ধরে। দুজনের বুকের ধুকধুকুনি এক হয়ে এক ছন্দে নেচে চলে, এক সুরে বেজে ওঠে। সেখানে আর কিছু নেই, আর কেউ নেই। কেবল যুগ-যুগান্তের সৃষ্টির সাক্ষী অভিন্ন হৃদয় একটি পুরুষ আর একটি নারী—দুটি শাশ্বত প্রেমিক মনের অবিচ্ছিন্ন মিলন মুহূর্ত।

পজন দেখছে, হীরের চোখের তারায় ডুবে যাচ্ছে ক্রমে। হারিয়ে ফেলছে নিজেকে। সেখানে একা হীর ভেসে উঠছে। হীর দেখছে, পজনের চোখের তারায় তার সকল অস্তিত্ব মিশে যাচ্ছে। নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে না। সেখানে একা পজন ভেসে উঠছে।

হাসিনার অনিচ্ছুক হাত হীরকে টেনে নিলে পজনের বুক থেকে। ওদের দুজনের তন্ময়তার ঘোর তখনো কাটেনি। ছাড়াছাড়ির পরেও যেন দুটি মনে ধরাধরি হয়ে আছে।

হাসিনার বুক কেঁপে উঠলো। শিওনন্দন শয়তান সব দেখে গেলো। এখুনি গাঁয়ে রটাবে। যদি তার নামে রটায় রটাক, সে মাথা পেতে নেবে। হীর বাঁচুক। কিন্তু···

পজন স্তম্ভিত।—তার বুক থেকে কেন টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে হীরকে হাসিনা? অপরাধ কী? দেখলেই বা শিওনন্দন। হাসিনা তাদের এ স্বর্গ-সুখে কেন বাধা দিলে?

হীরকে নিয়ে চলেছে হাসিনা। যতদূর দেখা যাচ্ছে, হীর মুখের ঢাকা খুলে, পিছু ফিরে চেয়ে চেয়ে দেখছে পজনকে। পজনও এক জায়গায় একভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তার নিমেষনিহত দৃষ্টি হীরের পিছু পিছু চলেছে।

হীর চলেছে, নিজেকে পজনের কাছে রেখে দিয়ে। পজন দাঁড়িয়ে আছে হীরকে কাছে পেয়ে।

হীরের অন্য সাথীরা পজনকে বোঝালে—সর্বনাশ উপস্থিত। সাবধান হয়ে থাকতে। শিওনন্দন লোক ভালো নয়। কখন কোন-দিকে ঝোড়ো হাওয়া বইবে কে জানে। আঁধিতে ধুলোর ঝড়ে

কাকে চোখ কানা করে আছড়াবে কে জানে। পজন যেন শহরে যাবার ব্যবস্থা করে অতি অবিশ্যি।

সাথীরা যে যার ডেরার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললো।

ভাঙাকুয়োর মাঠের কথা জানতে আর কারো বাকি রইল না—ছেলে থেকে বুড়ো অবধি। শিওনন্দনের মুখে সব শুনেছে হীরের মা-বাবা। বাবা রাগে অগ্নিশর্মা। মা ফণী মনসা।

বাপের কড়া হুকুম—হাসিনার সঙ্গে মেলামেশা, ওদের বাড়ি যাওয়াযায়ি একেবারে বন্ধ। হীরকে তালা বন্ধ করে রাখা হোক।

মা আরো একধাপ ওপরে। চোখে চোখে রাখেন—পাহারা দেন—একটু উনিশ বিশ হলেই গঞ্জনা—কূল মজানো মেয়েকে, হীরের মায়ের মতে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে হয়। মুখ দেখতে ঘেন্না! যমের অরুচি। চন্দ্রভাগার জলের কথা মনে পড়েনি কেন? ডুবে মলে হাড় জুড়োত যে।

হীরের ওপর উৎপীড়ন বেড়েই চললো। পজনকে না দেখা হীর মরার সামিল—নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া সব জলাঞ্জলি। মায়ের কাছে যন্ত্রণাকাতর আবেদন করলে হীর।

—আমায় বিষ খাইয়েই মেরে ফেলো। তোমরাও নিষ্কৃতি পাও, আমিও পাই।

হীর কিছু বললেই মা আরো সপ্তমে চড়ে ওঠে। হীরের কথা যেন তার কানে কে সিসে গলা ঢেলে দেয়।

—বলেছিলুম শর্মাজীকে ধিঙ্গি মেয়ের টো টো করে ঘুরুনি বন্ধ কর! শয়তানীর ভেতরে ভেতরে এই সব। নিরীহ শিওনন্দনের নামে মিথ্যে কলঙ্ক! এতদিনে কবে বিয়ে হয়ে যেতো!

পজনকে নিয়ে গাঁয়ে দুটো দল হয়ে গেলো—বামুন-কায়েত।

কায়েতরা বলে--পজনের গায়ে হাত দেওয়া মানে তাদের গায়ে হাত। তাদের বেইজ্জতি, কায়েত জাতের বেইজ্জতি।

বামুনরা বলে—একেবারে জাত ধরে টানাটানি। সর্বনাশের মাথায় পা। জাত গেলো তো আর রইলো কী! এর একটা হেস্তনেস্ত না করলে জাত বাঁচিয়ে বাস করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে পরে।

পজনের সাহায্যের জন্যে কায়েতরা এগিয়ে এলো। পজনও বেপরোয়া।—অন্যায় কী হয়েছে! মন আসল, প্রেম আসল, মানুষ আসল। মানুষ মানুষই। জাত তো মানুষেরই সৃষ্টি। এসব মানবে না পজন। গাঁ ছেড়ে যাবে না মোটে। দেখতে চায় কে কী করে। সেও পেছপা নয়। যেতে হয়, হীরকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তাকে একা রেখে যেতে পারা যায় না, তা যদি মরতে হয়, তবুও।

বামুন-কায়েত দুপক্ষেরই অস্ত্রশস্ত্রের আস্ফালন চলতে লাগলো। লড়ালড়ি আর হল না। দুপক্ষই সমান বলে বলী। বিবেচনা করে এগুতে হবে তো!

পজনকে পাহারা দিয়ে রেখে দেয় কায়েত সর্দার সুমনলাল। সুমনলাল পজনকে বোঝাতে থাকে—

—সিটিতে ফিরে যান। শিওনন্দন ব্যাটা ভারী পাজী। ওর বাপটাও তাই। হীরের সঙ্গে ছেলের বিয়ে ভেস্তে যাওয়ায় গোঁসা। বাপ-ব্যাটা উঠিপড়ি লেগেছে শর্মাজীর পেছনে। উত্যক্ত করে মারছে। ছুতোয়-নাতায় অপদস্ত করবার মতলব। এতদিন পেরে ওঠেনি। এইবার জব্বর দয়ে ফেলেছে।

পজন উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—অপদস্থ কীসের? জব্বর দয় কিসের? আমি তো হীরকে বিয়ে করতে চাই! সিটিতে যাবো না। গেলে হীরের কী অবস্থা হবে কে জানে!

মজনু অনেক বলেকয়ে অনুনয়বিনয় করে পজনকে রাজী

করালো। থমথমানি ভাবটা কেটে গেলেই পজনকে নিয়ে আসবে। উপস্থিত ঘরে ঘরে অগ্নিবৃষ্টিটা ঠাণ্ডা হোক। হীরের খবরাখবর সব হাসিনা মারফত পাবে। চিন্তার কিছু নেই।

গাঁয়ে পঞ্চায়েত বসলো। সকলের মতামত নেওয়া হল। শিওনন্দন ছাড়া গাঁয়ের অন্য কেউ জানে না হীর-পজনের গোপন প্রেম। এ ব্যাপারে একজন সাক্ষীর জবানীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যেতে পারে না। গাঁয়ের লোক হীর বা পজন কাউকেই দোষী করছে না। ওরা নির্দোষ। শর্মাজীই আগের মতো পঞ্চায়েতের প্রধান থাকবে। তার আসন থেকে তাকে নামানো হবে না।

আবার কায়েত-বামুন গলাগলি। কাদা ছোঁড়াছুড়ি থেমে গেলো। আঁধি এসেছে বটে, তবে সব ঠাণ্ডা করে দিয়ে চলে গেছে। হীরের মুক্তি। মুখে হাসি ফুঠে উঠেছে।

পজনের জন্যে গাঁয়ের বন্ধ দরজা আবার খুলে গেলো। গাঁয়ের ঘরে ঘরে ভুল বোঝাবুঝির জন্য ক্ষমা চাওয়াচায়ির পালা শেষ। সব মিটমাট। আগের আবহাওয়া আবার ফিরে এলো।

পঞ্চায়েতের রায়ের খবর পজনের কাছে জানালে হাসিনা। খবর পেয়ে পজন ক্লাসসুদ্ধ ছেলেদের—বিপক্ষ সপক্ষ সকলকেই জড়িয়ে ধরে ধরে আলিঙ্গন করলে। মিষ্টিমুখ করালে। সকলে অবাক—পজনের এতো আনন্দ কিসের! শাদিবিয়ে হবে—না, হয়ে গেছে আগে, তাই পরে—না, ছেলেপুলে হবার শুভ-সংবাদে এত নাচানাচি!

পজন মজনুকে বোঝাতে থাকে।

—এইবার নিয়ে চল একবার! অনেক দিন হল, আর পারছিনে হীরকে না দেখে থাকতে।

মজনু গম্ভীর হয়েই বললে।

—আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে হত না !

পজনের জিদ চেপে বসলো, সে যাবেই মজনু না নিয়ে গেলেও—

অগত্যা মজনুকে নিয়ে যেতে হল। স্টেশানে নেমে পাখী-পড়ানো করে, পজনকে এক কথা দশবার বোঝাতে লাগলো মজনু।

—খুব সাবধানে, দূর থেকে একবার হীরকে দেখেই ফেরবার পথ ধরতে হবে, বুঝলে ?

ছাদে দাঁড়িয়ে হীর ! তার চোখের নীরব দৃষ্টি গাঁয়ের পথে—কখন পজন আসে। হাসিনার কাছে খবর পেয়েছে—পজন আসছে।

একবার দেখবে সে, চোখ ভরে দেখে নেবে। জীবনভোর সে-দেখাকে ধরে রাখবে। কে জানে, এই দেখাই তার শেষ কিনা ! বাবা সগাইয়ের ব্যবস্থা করছে তাড়াতাড়ি। একবার যখন দুর্নাম রটেছে, তখন যত শীগগির, ভালোয় ভালোয় মেয়ে বিদেয় করতে পারলে তবে তার মঙ্গল।

কখন কী ফ্যাসাদ হয়ে পড়ে এই চিন্তাই সদা সর্বদা !

হীর পজনের চোখোচোখি হল। পজনের অবস্থা দাঁড়ালো 'সুন্দর অত বদন ঝলক বরনীয় না যাই—যোহি যোহি রূপ দেখত, পলক না পড়, পলক ছুটত।' হীরেরও সেই অবস্থা। দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ-বেদনা নিমেষে দুজনের মন থেকে ধুয়েমুছে গেলো। পেয়ে হারানো আর হারিয়ে পাওয়ার সুখানুভূতিতে দুজনেই মেতে গেছে ! নিজেদের ভুলে গেছে !

মজনু এ দৃশ্যে বিহ্বল। আহা ! এদের এ মিলন যেন কখনো না ভাঙে। খুদা মেহেরবানি কর !

এক রকম অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পজনকে ঠেলেঠুলে, হুঁশ করিয়ে টেনে নিয়ে চললো মজনু—আবার না বিপত্তি ঘটে। কেউ না দেখে ফেলে !

মানুষের প্রবল ভালো ইচ্ছে যেমন ভালোকে ডেকে আনে কাছে, তেমনি প্রবল বিপদের ইচ্ছেটাও বিপদ নিয়ে আসে। হলও

তাই। দূর থেকে একটা লাঠি ঠিকরে এসে পজনের মাথার পেছনটা ছুঁয়ে গেলো। পজন ঢলে পড়লো। হীর অস্ফুট আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো ছাদে।

আগের পঞ্চায়েতের রায় নাকচ হল। সভার সামনেই প্রমাণ করে দিয়েছে শিওনন্দন। পজনের রক্তারক্তি অবস্থা আর হীরের বেহুঁশ ভাব। আর প্রকাশের দরকার পড়ে না। একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। প্রধান সাক্ষী শিওনন্দনের জবানীর মূল্য যথেষ্ট —সে সব দেখেছে, শুধু দেখেনিই, উচিত মতো সাজা দিতে ভোলেনি বেকুফকে। গাঁয়ের ইজ্জত, জাতের ইজ্জত, হারদের খানদানের ইজ্জত বাঁচিয়েছে।

শর্মাজীকে বরপঞ্চের গদি থেকে বাতিল করে দেওয়া হল। উপস্থিত যে কদিন না সুস্থ হয়ে ওঠে পজন, মজনুদের বাড়িতেই থাকবে, তারপর চিরদিনের জন্যে গাঁয়ে আসা বন্ধ।

পজন ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মজনুর বাড়ি গাঁয়ের ছেলেরা দিনরাত সতর্ক পাহারা দিয়ে রাখবে। হীরের বাড়িও তাই করা হবে—দুজনের যাতে দেখা না হয় আর।

হীরের যেখানে বিয়ের ঠিকঠাক—ভেঙে গেলো। শিওনন্দন যেয়ে ভাঙচি দিয়েছে। হীর-পজনের সব কথা প্রকাশ করেছে।

মাথায় হাত দিয়ে বসলো হীরের বাবা।

হীর মরতে চায়, সুযোগ খোঁজে। পজন তার স্বামী। —পজন ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আর বিয়ে হতে পারে না তার। চারদিকের কড়া নজরে মরতে গিয়েও মরা হয় না হীরের। পজনের জন্যে উথাল-পাতাল মন দিনরাত।

শিওনন্দনের বাবা এলো হীরদের বাড়িতে। কাঁচাপাকা মহারাজী

গোঁফের দুপাশ পাকাতে পাকাতে, ভুরু নাচিয়ে কথা গিলে গিলে জাবর কাটতে লাগলো—গাঁয়ের মেয়ে হীর, আহা-হা! দেখলেও কষ্ট হয়! কত ভালোবাসে শিওনন্দনের মা। ওর জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা। ভাত-রুটি-নাস্তা সব ছেড়ে দিয়েছে।

আপনি গাঁয়ের মাথা ছিলেন। আবার মাথা হন এই ইচ্ছে। আমি চাইনে মাথা হতে—অত ঝামেলা পোয়াতে। সকলে ত্যাগ করতে পারে আপনাকে, কিন্তু আমি পারিনে। একটু থেমে যায় শিওনন্দনের বাবা। শর্মাজির বিষাদ-মগ্ন নিরুত্তর মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে নেয় একবার। জোরে নিশ্বাস ফেলে, আবার বলা শুরু করে।

—তা, অত ভাবছেন কেন? কেউ না নেয় আপনার মেয়েকে আমি ঘরে নেবো ছেলের বৌ করে। আপনার মানসম্ভ্রম, জাতকুল, খানদানি সব বজায় রাখবো আমি।

শর্মাজী দাওয়ায় সতরঞ্জি পাতা খাটিয়ায় বসে ঝিমুচ্ছিলো। চাঙ্গা হয়ে উঠলো—ঝিমিয়ে পড়া মনটা ভেসে যাওয়া, তলিয়ে যাওয়া কুটো আঁকড়ে ধরবার পথ পেলো। হাতে স্বর্গ পেলে শর্মাজী। ম্রিয়মাণ চোখে আশার ঝিলিক—এও ঈশ্বরের দয়া। অভাবনীয় ঘটনা—যেচে এসে একঘরেকে ঘরে নেওয়া! মুখ দেখা-দেখি বন্ধ, বন্ধুদের হাত ধরাধরি গলাগলি হল আবার।

আবেগ জড়ানো গলায় শর্মাজী বললে।

—আপনি এত মহৎ, উদার, আগে জানতুম না। ঠেকায় পড়লে বন্ধু চেনা যায় একথাটা সত্যি। আপনাকে ফেরত দিয়েছি। অপমান করেছি। তেমনি হয়েছে আমার। মাপ করুন! আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী—পাক্কি বাত।

সগাই হয়ে গেলো হীরের। শিওনন্দনের সঙ্গে বিয়ে হবে সামনের মাসে, বোশেখে—নতুন বছরের প্রথম মাসে। শর্মাজীর বুক আনন্দে ভরপুর। আর হীরের মায়ের তো খুশীর অন্ত নেই।

নির্জীব সোনার পুতুলী হীরকে নিয়ে সাজাতে লেগে যায় এখন থেকেই।

পজনের বাপ-মা ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করতে লাগলো। ভালো ভালো মেয়ে দেখা হল অনেক। পজনকেও দেখানো হচ্ছে। পজন রাজী নয়। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হীরকে না হলে আর কাউকে বিয়ে করবে না। সারা জীবন এমনি কাটাবে, তবুও না।

বি. এ. এগজামিন দেওয়া শেষ হল পজনের। অবসর যথেষ্ট। মজনুকে তুতিয়েপাতিয়ে রাজী করাতে চেষ্টা করে—দেশে নিয়ে যেতে।

মজনুর কান লাল হয়ে ওঠে। গরম আগুন।

—কী বলছিস্! নির্লজ্জ, বেহায়া কোথাকার! মুখ দেখাবার জো আছে আমার? তুই কা সে পথ রেখেছিস? বলছিস কোন আক্কেলে!

অপরাধীর কাঁচুমাচু মুখ পজনের। চুপ করে রইলো খানিক। হাসিনার শরণ নিলে কেমন হয়? সেও কী কিছু করতে পারবে না পজনের জন্যে—তার প্রিয়বন্ধু-সখী হীরের জন্যে? অনেক তো করেছে এরা, আজ নীরব কেন সব? হাসিনাকে চিঠি লিখলে পজন।

চিঠির জবাবে হাসিনা লিখেছে পজনকে।

হীর যেন কেমন হয়ে গেছে। মনে হয় তোমার কাছেই ওর প্রাণ -মন। এখানে দেহটা। নিজেকে তিলে তিলে দগ্ধ করে চলেছে। দিনরাত অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে তার বুক মাথায় মনে। সেই জ্বলন্ত আগুনেই একদিন ও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। হীরের বিয়ের ঠিকঠাক শিওনন্দনের সঙ্গে। সগাই হয়ে গেছে।

বজ্রাহাতের মতো স্থির হয়ে গেলো পজন। হাত থেকে খসে

পড়ে গেলো চিঠিটা। পজনের মা এসে ঐ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। পজনের দাড়ি ধরে নাড়া দিতে থাকে মা।

—কী হয়েছে বেটা? মেরেলাল, মেরে পজন!

সাড়া না পেয়ে কেঁদে ওঠে মা। মায়ের কান্নায় সম্বিৎ ফিরে পায় পজন।

পজন কী স্বপ্ন দেখছে? কোথায় সে? মা সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে কেন? নীচে পড়ে ওটা কী—চি-ঠি!

ব্যস, সামনে ফণাধরা বিষাক্ত সাঁপ দেখলে যেমন স্থির থাকতে পারে না কেউ, সেই রকম চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো পজন!

—না, না! কিছুতেই হতে দেবে না পজন। যা হোক ব্যবস্থা করতেই হবে।

মা ছেলের রকমসকমে ভ্যাবাচাকা।

পজন বললে—মা, আমি এখুনি বেরুবো।

করুণ কণ্ঠ মায়ের।

—বেটা, তোমার তবিয়ত ঠিক নেই। শরীর ভালো নয় মনে হচ্ছে। দেমাক—মন মাথাও। অন্য কোথাও যেও না!

চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে মা। ছেলের অশান্ত মনে নিস্তব্ধ উত্তেজিত ভাবের উৎস খুঁজে পায়। আশ্বস্ত করতে থাকে পজনকে।

—চিন্তা করে দেখতে সময় দাও পজন! অত উতলা হলে চলবে না! ধৈর্য ধর একটু!

ছেলের মন ঘোরাবার জন্যে বহু চেষ্টা করেছে মা এর আগেও। পারেনি। মায়েরও কম কষ্ট নয় এতে। কিন্তু চেষ্টা ছাড়া আর আছেই বা কী?

স্নেহ উপচে পড়ে মায়ের গলায়।

—পজন, বেটা! চলো, একটু বেরিয়ে আসি।

মায়ের ধরাধরিতে পজনকে যেতে হল রুমানীদের বাড়ি। মা'র অবিশ্যি ইচ্ছে, ছেলের মন ঘুরুক রুমানীর ওপর! তাহলে হীরের ঝোঁকটা কেটে যেতে পারে। পাগলামি ভাবটাও চলে যাবে। একটা সাময়িক প্রেমের নেশা ছেলেমেয়েদের যৌবনে ওরকম আসে। পরে সব হারিয়ে যায়। কে কোথা চলে যায় পাত্তা থাকে না। আশা হয় পজন ফিরবে। নিশ্চয় ফিরবে। মা তার নিরুপায় মনকে এই স্তোকবাক্যে সবল করে রাখতে চায়। ছেলের কাছে কিন্তু মা মনের গোপন ব্যথা, কথা জানায় নি কোনো দিন!

রুমানীর অত সাজগোজ, অত ঢংঢাং সব মিলিয়ে পজনের মনকে বেশী করে বিষিয়ে তুলছে।

মায়ের সঙ্গে আর কোনোদিন আসছে না। এই শেষ, এই সব মতলব ছিলো!

রুমানী ভাও দেখিয়ে দেখিয়ে, পাঞ্জাবের বহু প্রাচীন, বহু প্রচলিত লোকগীতি গাইতে লাগলো। পজনের দিকে হাত নেড়ে নাচের ভঙ্গি করে গান গেয়ে চললো। রুমানীর এই নাচ-গানের প্রধান নেপথ্য সহায়—দুজন। পজনের মা আর রুমানীর মা।

রুমানীর আচার—আচরণে পজন বিরক্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু রুমানীর কাছে ছাড়ান-ছিড়েন নেই। সে পজনকে গান শোনাবেই—

ঃ ম্যাঁয় নেইয়া জানা নি।
ঃ ম্যাঁয় ল্যায়কে জানাই।
ঃ আমি যাবো না যাবো না, শোনো
কিছুতেই না।
ঃ নিয়ে যাবোই যাবো, তোমায়
ছেড়ে যাবো না।

পজন দেখছে—হীর-এর কাছে বসে আছে সে। হীর হাসছে –

ঠাট্টা করে বলছে—আমি যাবো না···। পজন হাত ধরে বলছে, নিয়ে যাবোই···ছেড়ে যাবো না।

হঠাৎ পজনের মাথার মধ্যে একটা নীতিকথা উঁকি মারতে লাগলো।

—নিজেকে নিজের সাহায্যে লাগালে—নিজেদের সাহায্য করলে, ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেন।

গড হেল্পস্ দোজ, হু হেল্পস্ দেমসেলভ্‌স্।

রুমানীদের বাড়ি থেকে এসে পর্যন্ত, পজনের মনে খালি তোলপাড় করছে পথের নিশানা—হীরকে আনবার রাস্তা—মতলব—হয়্যার দেয়ার ইজ্ উইল্, দেয়ার ইজ ওয়ে।

কেঁদেকেটে অনেক করে মজনুর মন গলালো পজন। দেশে নিয়ে যেতে রাজী করালো।

যেখানে বেপথ, কেউ যায় না—ঝোপঝাড় জঙ্গল সাপখোপের আড্ডা, পোড়ো জমি, ভূতুড়ে উৎপাত, ডাকাতে উৎপাত, সেখানে—সেই পথ দিয়ে, মরণপণ করে, নিঝুম নিশীথে চলেছে পজন আর মজনু।

কাঁটাগাছের ঝোপের ভেতর দিয়ে পেরুতে পজনের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত—রক্তারক্তি। তবু পজন এগুচ্ছে। তার চোখের সামনে হীরের সজল দুটি চোখ খালি ভেসে বেড়াচ্ছে।

কৃষ্ণপক্ষের জমাট অন্ধকারে এপাশের মানুষ ওপাশে দেখা যাচ্ছে না। ঘুমন্ত গাঁয়ের মধ্যে জেগে আছে দুটি নিশ্বাস। দুটি বুকে উৎকণ্ঠা নিয়ে ওঠানামা করছে। পাতাঝরার আওয়াজেও চমকে

উঠছে—কেঁপে উঠছে গোপন নিশ্বাস দুটি। কেউ এলো নাকি, কেউ দেখতে পেলো নাকি!

হাসিনার কাছে সব জেনে নিয়েছিলো হীর। ছাদ দিয়ে হাসিনার বাড়ি এসে পৌঁচেছে। কেউ দেখেনি। কেউ জানে না। সব চুকেবুকে গেছে। পজন আর আসে না গাঁয়ে। সকলে নিশ্চিন্ত। হীরের ওপর কড়া নজর মুকুব হয়ে গেছে। নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে সকলে।

হাসিনা নিজে বোরখা পরেছে, হীরকেও পরিয়েছে। নিশ্বাস পড়া গুণে চলেছে হাসিনা-হীর—কখন মজনু আসে কখন পজন আসে। যতো দেরী হয়, ততো ওরা ভয়ে জড়সড়—ধরা পড়লো নাকি?

হীর আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে চাপা কান্নায় গোমরাতে থাকে।

দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম।

নিশ্বাস বন্ধ করে পজন মজনু এসে দাঁড়ালো। ভেজানো দরজায় হাত ঠেকাতেই খুলে গেলো। হীর ঝাঁপিয়ে পড়লো পজনের বুকের ওপর।

ফিসফিসিয়ে মজনু বললে—আর দেরী নয়—এখুনি! সেই আসা পথ—পরিত্যক্ত পথ দিয়েই রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো ওরা চারজনে। মাঝপথে হাসিনাকে বিদায় দিলে—এবার নিরাপদ—ওরা যেতে পারবে। খুদা রক্ষে করুন। হাসিনার চোখে জল। হাসিনা ফিরলো গাঁয়ের পথে! হীর পজন মজনু চললো গাঁ ছেড়ে। স্টেশনে এসে হাজির হল তিনজনে। তখনো শেষ রাতের ট্রেন এসে পৌঁছোয় নি। যতো ট্রেন আসবার দেরী হয়, ততো অস্থিরতা বেড়ে ওঠে পজনের। পায়চারি করতে থাকে ঘন ঘন। এক মিনিট এক এক ঘণ্টার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিগুণ ভাবে ধকধক করে ওঠে বুকের ভেতর। প্ল্যাটফরমে সে আওয়াজ ঘুরে বেড়ায়। পজন শুনতে পায়

স্পষ্ট! পজনের নিজের জন্যে কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু ধরা পড়ে গেলে হীরের কী অবস্থা হবে, সেই ভাবনায় পাগল হয়ে উঠছে।

হীরেরও উদ্বেগ চরমে উঠেছে। দারুণ অস্বস্তি। কতোক্ষণ—আর কতোক্ষণ ট্রেনের? হীর মরুক ধরা পড়ুক, দুঃখু নেই। কিন্তু •পজনের—

হীর বোরখা খুলে ফেলেছিলো। মজনু আটাকালে।

—অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অনেক লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসছে। বোধ হয় হীরের বাবা, কিংবা শিওনন্দন দলবল নিয়ে। মজনু সামনে গিয়ে হীর-পজনকে আড়াল করে দাঁড়ায়। সে মরুক, কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু হীর-পজন—ওদের প্রেম যেন না মরে।

পজন প্রস্তুত হয়ে মজনুর আগে দাঁড়ায়। হীরও থাকতে পারে না আর, পজনকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়তে চায় না কিছুতেই।

প্রতিযোগিতা চলে কে আগে মরবে।

স্টেশনে এসে পৌঁছলো যারা, ফিরেও চাইলো না ওদের দিকে। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই কারো দিকে।

তাদের মুখে চোখে দুরভিসন্ধির কোনো চিহ্নই নেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো তিনজনে। তিনজনেরই মনের ভেতর জপমালা —আর তো পারা যাচ্ছে না, সময় হয়ে গেলো, তবু এতো দেরী কেন ট্রেনের?

যারা এসেছে, তারা ভিন গাঁয়ের লোক। মুখে-চোখে আতঙ্কের ছাপ। ফিসফিসিয়ে কথা কইছে কেবল। তারাও ট্রেনের জন্যে অস্থির হয়ে উঠছে।

তারা পেছন ফিরে তাকাতে লাগলো। সরে সরে এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসলো। প্ল্যাটফরমে একটা থমথমে আবহাওয়া।

ট্রেন আসছে। বাতাসে একটা ধোঁয়াটে গন্ধ। দূরে আকাশে

পাকানো ধোঁয়ার নিশানা নজরে পড়ছে। রাতের অন্ধকার ফিকে ফিকে।

ট্রেন এলো।

সকলে প্রাণ পেলো। খট খট খটাং, ঝক ঝক ঝকাং—চলেছে ট্রেন। জানলায় মুখ রেখে চেয়ে রয়েছে গাঁয়ের দিকে ওরা তিনজনেই —হীর পজন মজনু। যাক, বিপদ কেটেছে এবার।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ ওদের—একি দেখছে ওরা! দূরে দূরে গাঁয়ের মাঝে মাঝে লাঠি পেটাপিটি। সঙ্গে তলোয়ারও ঘুরছে। দূরে থেকেই মনে হচ্ছে রক্তের চন্দ্রভাগা বইছে। দাংগা এগিয়ে আসছে স্টেশনমুখে। মজনু পজনের কানে কানে বললে—

—নিশ্চয় গাঁয়ের কায়েত-বামুন লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কী কাণ্ডটাই না হবে! হাসিনাটা বাঁচলে হয়, ধরা পড়লো কিনা কে জানে!

ভিনগাঁয়ের ছেলে একটি বলেই ফেললে—

—আর একটু দেরী হলে ওরা খুন করে ফেলতো আমাদের নির্ঘাৎ! কী কষ্টে না এগাঁ-ওগাঁ করে এসেছি!

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলে পজন—কী ব্যাপার?

ওদের মধ্যে থেকে একজন বুড়ো বললে—

জী, হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। কিন্তু গাঁয়ে গুজব ছড়িয়ে গেছে—অমৃতসরে সমস্ত মুসলমান মেরে শেষ করে ফেলা হয়েছে। তাই গাঁয়ের মুসলমানরা ক্ষেপে গেছে হিন্দুদের ওপর। অবিশ্যি ঠিক গাঁয়ের নয়, নতুন মুখের আমদানি হয়েছে অনেক। তাদের উস্কানিতেই হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে বেশী। এখন ট্রেন থেকে দেখছি দাংগা শুরু হয়ে গেছে হিন্দু-মুসলমানে!

বোরখাপরা হীরের দিকে চেয়ে ভয়ার্তকণ্ঠে বুড়ো বলে ওঠে—জনাব, আপলোগ?

পজন মৃদু হেসে বললে—

কোনো ভয় নেই! ওদের মধ্যে কী হয়েছে সে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কী দরকার? আমরা সব ভাই ভাই। মজনু দাঁড়িয়ে উঠলো। সবাইকে সাহস দিলে। বলতে লাগলো—

—৪৬ সনের আগষ্ট বাংলায় যে হিন্দু-মুসলমান দাংগা হয়ে গেল। কাগজ মারফত—সে খবর চারধারে ছড়িয়ে গেছলো, ওখানেও। কিন্তু পাঞ্জাবে তেমন কিছু কী হয়েছে আজ অবধি? যা একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিলো, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

গত বছরের আগষ্ট আর এ আগষ্ট সমান হবে না। অন্তত আমি জোর গলায় আপনাদের সাহস দিতে পারি!

আমরা যেখানে যাচ্ছি সকলে—যে লাহোর সহরে, সেই লাহোরই ১০১৩ সনের পঞ্চাল নগরী। তখন আফগানের ব্রাহ্মণ রাজার অধীনে ছিলো! সেই থেকে পর পর হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান সকলেই রাজত্ব করেছে। সকলে রক্ত দিয়ে লাহোর গড়েছে। হিন্দুদের মন্দির ছড়ানো চারধারে, তাছাড়া আওরঙ্গজেবের তৈরী বাদশাহী মসজিদের মহম্মদের পবিত্র চুল রাখা আছে। মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের সমাধি। শিখ গুরুদ্বারা, ক্রিশ্চানদের চার্চ সব কিছু মিলিয়েই হিন্দু-মুসলমান শিখ ক্রিশ্চান এক হয়ে মিশেছে পবিত্র লাহোর সহরে। এখানে এক ভাই-ই চার, আর চার ভাই-ই এক। আপনারা এবার ওধারের ঘটনায় বিচলিত হবেন না। নিশ্চিন্ত থাকুন লাহোরে কিচ্ছু হবে না।

মজনুর বক্তৃতা শুনে, সকলের ধড়ে প্রাণ এলো। মনের জোর ফিরে পেলো। সাহস এসেছে।

লাহোরে আসবার জন্যে ছোটোছোটো স্টেশনে ট্রেন আর থামলো না। সব স্টেশনই গরম হয়ে উঠছে। যতোদূর দেখা যাচ্ছে, গাঁয়ে গাঁয়ে আগুন ধরা ধোঁয়া আর ধোঁয়া—আত্মরক্ষার তাগিদ আর অপরকে হত্যার তাগিদে দুপক্ষেরই অস্ত্রের ঝনঝনানি।

তবুও মজনু সকলকে ভেঙে পড়তে দিচ্ছে না—আসুক লাহোর।

লাহোর এলো।

সহরে ঢুকেই সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যে, যে ধারে পারলো, প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে লাগলো, আপন পর লক্ষ্য না রেখে, দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।

মজনু পজন হীর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মজনুর গলায় ক্ষোভ-আক্ষেপ ফেটে পড়লো—এখানেও বেধে গেলো পজন !

লাহোর সহর যেন অগ্নিকুণ্ডের মাঝে দাউ দাউ করে জ্বলছে। লকলকে শিখা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা সহরটাকে গ্রাস করবে বলে। বাড়িতে বাড়িতে হাহাকার—আর্তনাদ। বিভীষিকার রাজ্য হয়ে গেছে লাহোর। বাতাসে জ্যান্ত মানুষ পোড়া গন্ধ।

রক্তপাগল আদিম প্রবৃত্তি বন্ধ দরজা খোলা পেয়েছে—ছাড়া পেয়েছে। তাদের উন্মত্ততার খোরাক থেকে শিশু নারীরাও নিস্তার পাচ্ছে না।

রাস্তা পেরুতে লাগলো ওরা পাশাপাশি।

হীর পজনকে বললে,

—বোরখা খুলে ফেলি ?

দৃঢ়কণ্ঠে মজনু বললে,

—না। ওইটাই যদি তোমায় বাঁচায় এই নরকরাজ্য থেকে। দূর থেকে একটা মুসলমানের দল এই দিকেই আসছে যেন। পজনের বাড়ি অবধি পৌঁছবার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল। দুর্বৃত্তেরা ওদের ঘিরে ধরলে। মজনু আপ্রাণ চেষ্টা করে বোঝাতে লাগলো—আমরা মুসলমান, ভাই ভাই দোস্ত।

দুর্বৃত্তরা পরীক্ষা করতে গেলো পজনকে। মজনু এগিয়ে গেলো তাকে আগে পরীক্ষা করাতে—ওদের নিঃসন্দেহ করতে। কিন্তু কিছুতেই তারা পজনকে ছাড়বে না। আগে ওকেই পরীক্ষা করবে। মজনু বাধা দিতে গেলো। চারধার থেকে একটা প্রাণ কাঁপানো চীৎকার উঠলো —মারো মারো কাফের লোককে।

হীরের বোরখা টেনে খুলে ফেললে একজন দুর্বৃত্ত। হীর তার

গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিলে। পজন এগিয়ে গিয়ে চেপে ধরলো লোকটাকে। পেছন থেকে পজনের পিঠে ছুরি বসিয়ে দিলে অন্যজনে। পজনকে বাঁচাতে গিয়ে, ঠিক পজনের মতোই অবস্থা হল মজনুর। দুজনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো রক্তাক্ত দেহ নিয়ে। বুকফাটা করুণ আর্তনাদ করে উঠলো হীর। চেতনা হারিয়ে ফেললো।

তার পরের ঘটনা জানা নেই হারের। জ্ঞান যখন হল, তখন হীর পালকের বিছানায় শুয়ে। মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে এক বীভৎস-দর্শন পুরুষ। ভয়ে আঁতকে উঠলো হীর। আবার অজ্ঞান।

কেটে গেলো অনেকদিন।

হীর শুনেছিলো, গুণ্ডারা তাকে, এই তিন বেগমের বাদশা স্বনামধন্য হাফিজ সাহেবের কাছে অনেক টাকায় বিক্রি করে গেছে।

হীর হাফিজের প্রিয় বেগম হল। হাফিজ তার নাম দিলে শার্ফুন্নিসা—নাদিরা আনারকলি।

প্রতিরাতেই হীর সুযোগ খুঁজেছে, হাফিজের কাছ থেকে পালাবার। পায়নি কোনোদিন। রাতদিন তার চোখের সামনে ছায়ামূর্তিরা আসতো—রক্তেডোবা পজন, রক্তেডোবা মজনু। তারা গভীর রাতে হাতছানি দিয়ে হীরকে ডাকতো। ডাকে।

শার্ফুন্নিসার জীবন কাহিনী শুনতে শুনতে, ডাক্তার কখনো টেবিলে দমাদম ঘুষি মেরে হাত ফুলিয়েছে, কখনো শিউরে উঠেছে। কখনো কেঁদে আকুল হয়েছে। কখনো বিস্মিত, কখনো অভিভূত হয়ে পড়েছে।

কোথা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে কারো খেয়াল নেই। হীরের রাজ্যে শাফুর্ন্নিসা আর ডাক্তার ঘুরে বেড়াচ্ছিলো এতোক্ষণ।

কাহিনী শেষ করে শাফুর্ন্নিসা বললে,

তার পরের ঘটনা আপনার এখানে আসা। হীর থেকে শাফুর্ন্নিসা শাফুর্ন্নিসা থেকে শীরীতে পরিবর্তন হওয়া।

ডাক্তার বুকভাঙা নিশ্বাস ফেললে একটা। শাফুর্ন্নিসাকে অনুনয় করে বললে।

—না, ম্যাডাম। যেতে হবে না কোথাও আপনাকে! আত্মসম্মান বজায় রেখেই এখানে থাকতে পারবেন চিরকাল! ডাক্তারের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পরলো। হীরেরও।

যীশুর সামনে জোড় হাতে প্রার্থনা করছে ডাক্তার,

—প্রভু! অতীতের ফসিলের ওপর যে নতুন যুগের ভিত গড়ে উঠলো, আর যেন সেখানে দুঃস্বপ্নের অতীত যুগ ফিরে না আসে কখনো। আধিপত্য বিস্তার, স্বার্থপরতার মৃত্যু হক! ভুল-অন্যায়কে ক্ষমা কর প্রভু! শুভমতি দাও সকলকে! দুনিয়ার সকলে একই ঈশ্বরের সন্তান। সকলে ভাই, এই সত্যটা প্রত্যেকের প্রাণে জাগিয়ে তোলো প্রভু!

৪৭ সনের দাংগার পর লাহোরে হিন্দু-নিশ্চিহ্ন। কাকে খুঁজে পাবে ডাক্তার? শাফুর্ন্নিসার কাছ থেকে ঠিকানা নিলে। নানা জায়গায় খোঁজ করলে। কোথায় কে গেছে কী মরেছে,—কোনো পাত্তাই কেউ দিতে পারলে না পজনের। মজনুরও। দুজনেরই আত্মীয় স্বজনদের পর্যন্ত কোনো খবরাখবর কেউ জানে না!

—আগে কোনোদিন যে, দুভাই—হিন্দু-মুসলমান হাত ধরাধরি করে, গলাগলি—পাশাপাশি থাকতো—তারা যে, একদিন একমন একপ্রাণ ছিলো, তা ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকতে পারবে কিনা, কোনোদিন ভবিষ্যৎ বংশধরেরা জানতে পারবে কিনা কে জানে।

ডাক্তার গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছে সব কথা। সেও দাংগায় আহত হিন্দুকে চিকিৎসা করেছে, সেবা করেছে, ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছে তার সাধ্য অনুযায়ী। আহত মুসলমানদেরও। তার কাছে হিন্দু-মুসলমান দুই সমান। কিন্তু পঞ্জন-মজনু নামে কোনো লোকের কথা তার মনে পড়ে না।

শার্ফুন্নিসা লক্ষ্য করছে ডাক্তার আগেকার মতো নেই। ডাক্তারের মুখে প্রাণখোলা মিষ্টি হাসি মিলিয়ে গেছে কোথায়।

—ডাক্তার!

—বলুন!

—কদিন ধরে এতো অন্যমনস্ক দেখছি কেন? ভাবেন কী? আমার বিষয়ে কী?

—ভাবি ম্যাডাম, ছোটোবেলা থেকে পর পর ঘটনা সাজালে কী দুঃখের জীবন আপনার! সত্যি বলছি ম্যাডাম! আপনার কথা শোনবার পর থেকে···।

—ভাববেন না ডাক্তার, আমার জন্যে এরকম দুঃখু পেলে, মন-মরা হয়ে থাকলে, আমি তাহলে থাকি কী করে এখানে!

ডাক্তারের বুকে যেন সজোরে শাবলের ঘা পড়লো।

—না, না, ম্যাডাম। ভাববো না আর। কথা দিচ্ছি—ভাববো না। নিশ্চিন্ত থাকুন।

শার্ফুন্নিসার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

—কী নিঃসহায় স্পর্শ-কাতর মন ডাক্তারের! আহা!

১৯৫৩। প্রথম দিকে।

ডাক্তার মুখার্জীর চেম্বারে শয়দা এসে ফিস ফিসিয়ে বলতে লাগলো,

—ডাক্তার সাব! একটা রুগীকে নিয়ে আসছি। সব ব্যাপারটা গোপন রাখবেন কিন্তু। আপনি আমাদের বাপজান। ভরসা রাখি আপনার ওপর।

রুগী নামলো টাঙা থেকে, বোরখা ঢাকা। বোরখা ঢাকা মুসলমান মেয়েদের ডাক্তারের বাড়ি আসা অসম্ভব। ডাক্তারের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এ বিষয়ে—মুসলমান মেয়েদের চিকিৎসা করা একটা দারুণ সমস্যা—মহাবিভ্রাট।

অন্দরমহলে নিয়ে আসা হল রুগীকে--প্রাইভেট চেম্বারে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ ডাক্তারের।

রুগী যন্ত্রণাকাতর হেঁড়ে গলায় বলছে—

—গুস্তাকি মাফ কর না ডাক্তার সাব! ম্যাঁয় ঔরৎ নহী,—মরদ্। পা বাড়িয়ে দিলে রুগী—বুলেটের টুকরো ঢুকে রয়েছে।

অপারেশনের পর, ডাক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরলে শয়দার মুখের দিকে।

—সবাই পেটের দায়ে ডাক্তার সাব, পেটের দায়ে। আমীর-উমীর মুনাফা লুটবে। জান দেবে ফকির গরীব।

এ আমার ভাইজান রেজ্জাক। রেজ্জাক পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে, ভারতে জিনিসপত্র চালান দেয়াদিয়ি করে। তার জন্য কোনো রকমে পেটটা চলে। তাও ভরা পেট নয়—আধা। চাকরি কমিশনের ওপর। কিছু না লেনদেন করতে পারলে, উপোস করে মলেও মালিকের গোঁসা যাবে না। খুদাতাল্লার মেহেরবানিতে যে, বেঁচে ফিরে এসেছে এইটুকুই যথেষ্ঠ। প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ নিয়েই বেসাতি এদের।

বেশ ছিলুম সাব, দেশ ভাগের আগে। ভাগ হয়ে গেল। দুঃখ ঘুচলো কই, বাড়লো আরো!

রেজ্জাক শয়দাকে থামিয়ে দিলে। মুখ খুললে,

—আরে থাম! কতদিন ধরে এ কারবারে আছি ডাক্তার সাব—কোনো শালা ধরতে পারেনি? গায়ে আঁচড় কাটতে পারেনি একটা।

ওই শালা হারামি ইন্সপেক্টরটা—কী যেন নামটা ওর—দূর ছাই মনে পড়ে পড়েও পড়ছে না। ওর মুখে জুড়ি লাগাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে—পজনা না সজনা হবে। যাই হক —ওর জান আর বেশীদিন নয়। ওই ব্যাটা আসবার পর থেকে নানা দুর্ভোগ যাচ্ছে আমাদের।

শয়দা বে-আক্কেলে ভাইজানকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরবার উদ্যোগ করতে লাগলো। কিন্তু রেজাকের বক্তৃতার স্রোত না থামলে কি করে নিয়ে যাবে! আর তাছাড়া ডাক্তারসাবের নেকনজর ভায়ের ওপর পড়েছে, তা না হলে মন দিয়ে শুনছেন এতো! আর একটু যাক।

রেজাকের কথা রোধ করে কে? সে আপনমনেই বলে চলেছে···

—ব্যাটাকে দেখে নোবো! বাছাধন চেনে না এখনো রেজাককে! গুলি চালানোর অর্ডার দিয়েছে—বেপরোয়া অর্ডার। মানুষের জান নিয়ে ছিনিমিনি!

সেপাইরা গোড়ায় জানিয়ে দিয়েছিলো আমাদের হারামি বাচ্চার গুণের কথা। দুধারেরই সেপাইদের মুখে শুনেছিলুম—ব্যাটা নাকি এই লাহোরেই আগে থাকতো। পাকিস্তান হবার আগে। খুব বরাতজোর মরতে মরতে বেঁচে গেছলো। কী ভাবে ভারতে গিয়ে পড়েছিলো কে জানে! এখন কাহানগড় সীমান্তচৌকির দুঁদে ইন্সপেক্টর।

ঠিক আছে—ব্যাটাকে দেখে নোবো! ও ব্যাটার কী করি, ডাক্তার সাব শুনবেন! পাটা একটু ঠিক করে নি আগে। তারপর···

রেজাকের মুখে 'পজন' কথাটা শোনা থেকেই শাফুন্নিসার সজল চোখদুটো খালি ডাক্তারের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

গভীর রাত ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে পড়লো ডাক্তার।

—এই কী সেই পজন ? ঘটনার কতকটা কতকটা মিললেও প্রকৃতিটা সম্পূর্ণ আলাদা। এতো কঠোর নির্মম প্রকৃতি যে, ম্যাডামের বলা পজনের সঙ্গে অনেক ফারাক। একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী ?

তিনদিন পর। ড্রেস করাতে এলো রেজাক। ব্যাণ্ডেজের এক এক পাক খুলতে খুলতে ডাক্তার এক একটি প্রশ্ন করে যায় রেজাককে।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন, কেমন করে ওপারে যাও, কোথা দিয়ে ?

কতো অসম সাহস রেজাকের ! ডাক্তারসাব খুশ হয়ে জিজ্ঞেস করছেন। বাড়ি গিয়ে ভাইজানের কেবল মিছিমিছি বকাবকি—ডাক্তারসাবকে বিরক্ত করলি, বিরক্ত করলি !

রেজাকের কথার উৎসাহ উছলে পড়ে।

রেজাক বলে, চেক পোস্ট আছে দুধারেই, সব আছে—পুলিশ, মিলিটারী—খানিক দূরে দূরে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। কেউ মার্চ করছে—যাচ্ছে আসছে ! মাঝে মাঝে মিলিটারী বোঝাই ট্রাকের আনাগোনা। তার ওপর আছে আবার দুপক্ষের ইন্সপেক্টর সাহেবদের কড়া নজর সেপাইদের ওপর—ঠিক পাহারা চলছে কিনা। এপার ওপার আসা যাওয়া কেউ করছে কিনা। মালপত্র পাচার হচ্ছে কিনা।

কিন্তু এতো তোড়জোড়, এতো পাহারা, এতো চোখ—প্রাণান্ত-কর জবর হুকুম—গুলি ছুঁড়বে, তবুও কী আটকাতে পারছে কেউ কিছু ? যা হবার তা হচ্ছেই।

খানিক চুপ করে যায় রেজাক। ডাক্তারের সতর্ক কান, অনুসন্ধানী মন, কৌতূহলী চোখ অস্থির হয়ে পড়ে।

—তাহলে যাও কী করে, কোন ধার দিয়ে ?

—যাই ! রাস্তা আছে—দুদিকের পাশে পাশে পোড়ো গাঁ, জঙ্গল—তার ভেতর দিয়ে—ওদের সহস্র চোখ এড়িয়ে।

আবার থেমে যায় রেজাক। কী যেন ভাবে। আচমকা ক্ষ্যাপার মতো চীৎকরে করে ওঠে,

—কই, তোরা পেরেছিস আমাদের মন ভাগ করতে ?

ওই পোড়ো গাঁয়ের বসতিতে ছু-এক ঘর পুরনো দোস্তেরা আছে। এখনো দোস্ত তারা। থাকবেও বরাবর লোকচক্ষুর আড়ালে।

তাদেরও উপোসী পেট, আর আমাদেরও। এ দোস্তির ছেদ নেই কোনোকালে। এ যে উপোসী পেটের দোস্তি। —ছুদিকে সমান। এখানে কোনো সীমানা নেই ডাক্তার সাহাব। ওপরওলাদের দাবড়ানি আছে খালি।

রেজাক চলে যায় তার কাজ সারা হতে। ডাক্তার একলা বসে ভাবে—তার কাজ সারা হল কই! কেমন করে খোঁজ পাওয়া যায়—এই পজন কোন পজন ?

শার্ফুন্নিসা জিজ্ঞেস করে ডাক্তারকে,

—দিন দিন বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন, কিছু তো বলছেন না ? নিরুত্তর ডাক্তার চাপা নিশ্বাস ফেলে একটা।

শার্ফুন্নিসার বুক ঢিব ঢিব করতে থাকে। সবই তো ডাক্তার তাকে বলেন, সুখ-দুঃখু সব কথা—কৃষ্ণভামিনী মরে যাবার পর থেকে। তবে···

এখন ডাক্তার এতো নির্লিপ্ত, এতো নির্বিকার কেন ? শার্ফুন্নিসার মাথা গুলিয়ে যায়।

ডাক্তার বসে থাকে মৌনমুখে। যদি সে পজন না হয়—তাহলে ম্যাডামকে জানিয়ে—অসুস্থকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে ডেকে, যন্ত্রণা দেবার মতো হবে না ?

ম্যাডাম তার জন্যে ভাবছে—তার কী চিন্তা। কিন্তু এক্ষেত্রে এখন বলবার উপায় নেই। ম্যাডাম নতুন করে আঘাত পাক, তা চায় না ডাক্তার।

ম্যাডাম কষ্ট পাচ্ছে। তবু বেশী কষ্টকে রুখতে হবে।

নিয়মিত ড্রেস করাতে এলো রেজাক। আবার আগের দিনের ব্যাণ্ডেজ খোলা, ডাক্তারের প্রশ্ন, রেজাকের উত্তর চলতে লাগলো।

ডাক্তার—তোমার দোস্তদের জন্যে মন কেমন করে?

রেজাক—করে ডাক্তার সাব, খুবই করে।

ডাক্তার—তুমি কী সত্যিই দোস্তের বাড়িতে গিয়ে ওঠ?

রেজাক—হ্যাঁ, সাচ্ বলছি। বিশ্বাস হচ্ছে না? যাবেন একদিন আমার সঙ্গে?

অদম্য ইচ্ছে চাপতে পারে না। মুখ ফুটে বলে ফেলে ডাক্তার,

—আমায় নিয়ে যেতে পারবে রেজাক?

রেজাকের চোখেমুখে হাসির ঝিলিক।

—পুরনো দোস্তের সঙ্গে—দেখা করবেন বুঝি? আচ্ছা।

সান্তপুরা গাঁয়ের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলতে লাগলো ডাক্তার আর রেজাক—ঝোপের আড়ালে গাছের আবডালে অতি সন্তর্পণে চুপি চুপি। কোথাও দাঁড়িয়ে কোথাও বসে, কোথাও বা কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে, পরে হামাগুড়ি দিয়ে সীমানা পেরিয়ে এসে পৌঁছল ভারতে—কাহানগড় গাঁয়ে।

সান্তপুরার পথ চলার দুর্ভোগ কাহানগড়েরও কতক রাস্তা ভোগ করতে হল ওদের। একটা পোড়ো বাড়ির দরজায় এসে ঠোকা মারছে রেজাক। এ টোকা ভিন্ন ধরনের। দরজা খুলে গেল। মধ্যবয়সী লোকটি বেরিয়ে নিবিড় আলিঙ্গন করলে রেজাককে, আর ডাক্তারকে একগাল হেসে নমস্কার জানালে।

রেজাক পরিচয় করিয়ে দিলে ডাক্তারের সঙ্গে তার বন্ধু নন্দনের। নন্দন পুরনো বাসিন্দে। বাপ-ঠাকুরদাদার দেশের বাড়ি আঁকড়ে

পড়ে আছে এখনো। আত্মীয়স্বজনরা অমৃতসরের দিকে চলে গেছে! তাদের মান আছে, ইজ্জত আছে, দৌলত আছে, প্রাণ আছে! বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তো থাকতে পারা যায় না সব সময়! কখন কী ঘটে?

নন্দনের সে সমস্ত ভয়টয় নেই। সে দেশকে ভালোবাসে। বাঁস্তুভিটে ত্যাগ করতে নারাজ। তাই শুকনো পেটেও মাটি কাঁমড়ে পড়ে আছে—জন্মভূমি ছাড়া যায় না।

দারিদ্র্যের ছাপ সম্পূর্ণ মুখটায় ছেয়ে ফেলেছে নন্দনের। তবুও বিষাদ-বষণ্ণ হাসিটি লেগেই আছে। মেহেমান ডাক্তারসাবকে, কী করে সন্তুষ্ট করবে, কী খাওয়াবে এই নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। ডাক্তার দ্বিধাগ্রস্ত বিব্রত। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে আন্তরিকতা দেখে।

কুণ্ঠার সঙ্গেই ডাক্তার বললে,

—ব্যস্ত হবেন না। আপনিও আমার দোস্ত। কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না। আমি আসবো একদিন যদি মেহেরবানি করে আমায় একটু মদত—একটু সাহায্য করতে পারেন।

সরলভাবে জবাব দিলে নন্দন,

—আমার যতোটুকু তাকত আছে, ক্ষমতা আছে আমি করতে প্রস্তুত। হুজুর কী মনে করেন আমার দ্বারা তা সম্ভব?

ডাক্তার দৃঢ়ভাবে বললে,

—হ্যাঁ, আপনার দ্বারাই সম্ভব সে কাজ। আমি সময় মতো এসে জানাবো'খন। আজ থাক। ফিরতে হবে আবার।

ফেরার সময় চলতে চলতে রেজাক বারে বারে ডাক্তারকে সাবধান করে দিলে,

—এই দিক দিয়েই আসবেন যাবেন। সামনা সামনি একেবারে নয়। সেপাইদের নজরে পড়ে যাবেন তাহলে! ওপথে নিশ্চিত বিপদ। আমরা এতোদিনের পোড়খেয়ো হয়েও একটু অসাবধানে শর্টকাট

করতে গিয়ে, এমন বেকায়দায় পড়ে গেলুম—আপনি তো সবই জানেন, আপনি না হলে, পা'টা খোঁড়াই হয়ে যেতো।

শাফুন্নিসার দুশ্চিন্তা—ডাক্তার কোথায়, কী করে। কিছুই জানায় না আর। কখনো ফেরে বাড়িতে, কখনো না। সব যেন কেমন কেমন। একটা উদাসী উদাসী ভাব। শরীরটাও বেশ ভেঙে পড়ছে দিন দিন। হয়েছে কী, তাও জানবার উপায় নেই। চাপা ব্যথা গুমরোতে থাকে—সবই তো হারিয়েছে শাফুন্নিসা,—কেন মিছে ডাক্তারের স্নেহে আবদ্ধ হল আবার! ওকি নসিবের নিষ্ঠুর পরিহাস! ডাক্তার বোঝে শাফুন্নিসার মনোভাব। কিন্তু তবুও নিশ্চুপ। এখনো নয়, আগে সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে নিয়ে তবে।

এবার রেজাক ছাড়া একাই চললো ডাক্তার কাহানগড়ে—নন্দনের কাছে—রেজাকের দেখানো পথ ধরে ধরে।

ডাক্তারকে দেখে নন্দন খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

ডাক্তার নন্দনকে চুপিচুপি বললে,

—যে কথা বলবো, যে কাজ করতে হবে ভয় পাবার কিছু নেই আপনার। বিশ্বাস করতে পারেন আমায়। কোনো ক্ষতি হবে না।

কৌতূহলী হাসি চাপতে পারে না নন্দন। হাসতে হাসতেই বললে,

—আমাদের পেশাই তো ওটা, এতো সংকোচ করছেন কেন?

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর।

—না, ও কাজ নয়।

রেজাক হতভম্ব।

—তাদের কাজ নয়, অন্য! সে আবার কী! নন্দন ভাবে, ডাক্তার কতো হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু—রেজাকের মুখে সব শুনেছে।

ডাক্তারই একমাত্র মানুষ—যাকে প্রাণখুলে বিশ্বাস করতে পারা যায়।

ডাক্তার নন্দনের হাত ধরে অনুরোধ করলে,

—কারো কাছে প্রকাশ যেন না হয়!

থতমত খেয়ে নন্দন বললে,

বলুন! জবান দিচ্ছি, প্রকাশ হবে না।

ডাক্তার বললে,

—রেজাকও জানবে না কিন্তু! এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

একটু ইতস্তত করে ঢোঁক গিলে, নন্দন বললে,

—জী! হুজুর!

—পজন ইন্সপেক্টরের ডেরা দেখিয়ে দিতে হবে! অবিশ্যি দূর থেকে।

নন্দনের সর্বশরীর কেঁপে উঠলো। মুখে কথা আটকে গেলো। ঢুঁদে ইন্সপেক্টর পজন! তার ব্যবসায় স্বার্থের—পেটের দুষমণ পজনের ডেরা। সবনাশ! নন্দনের মনে দ্বন্দ্বের উঁকিঝুঁকি।

নিজের সর্বনাশ কেমন করে করা যায়। ডাক্তার কী ছদ্মবেশী গুপ্তচর? না, তাহলে আমাকেই বা বলবে কেন? রেজাকরা ওর খুব অনুগত। ডাক্তার অন্য ধরনের হলে নিশ্চয় রেজাক কখনো নিয়ে আসতো না!

নন্দনের মুখেচোখে আতঙ্ক।

ডাক্তারের ঠোঁটের কোণে নির্ভীক হাসি।

—ভয় পাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, ডাক্তারসাব! আমাদের ভাতঘরে হাত একেবারে।

—না, নন্দনজী! আমি তো বলেছি ক্ষতি হবে না। আমি তার কাছে কোনো কথাই জানাবো না আপনাদের সম্বন্ধে। এখানকার পরিচয়ও না।

নন্দনের অবস্থা নিরুপায়। যা থাকে কুলকপালে। দূর থেকে দেখিয়ে দিলে কাহানগড় চেক পোস্ট।

—ওখানেই পাবেন ডাক্তার সাব। পজন ইন্সপেক্টর নতুন এসেছে কদিন। পাকিস্তান থেকে এসেছি, মোটে ভাঙবেন না! এখানকার গাঁ থেকে যেন আসছেন আপনি।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ নন্দনজী।

শাফুন্নিসার কাছে শোনা কথায়—পজনের চেহারা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আইডিয়া করে নিয়েছিলো ডাক্তার।

চেক পোস্টের কাছ বরাবর যেতেই দেখতে পেলো—একজন ইন্সপেক্টর গটমট করে বেরিয়ে আসছে চৌকি থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ডাক্তার–এই সুযোগ। এগিয়ে গেলো।

—গুরু গম্ভীর গলা—কৌন?

—দোস্ত!

কাছে এলো ইন্সপেক্টর।

—কী চান আপনি? কোথা থেকে আসছেন?

—আপনার সঙ্গে কথা আছে, দয়া করে শুনুন। সব বলছি।

ইন্সপেক্টরের মনে সন্দেহ জাগে। —কী জানি কী ব্যাপার! এসব জায়গায় বিশ্বাস নেই।

ডাক্তারের সামনে পিস্তল উঁচিয়ে একটু পাশে নিয়ে যায় ইন্সপেক্টর। চারধার ভালো করে দেখে নেয়—লোকটার সঙ্গে কেউ এসেছে কিনা, দলটল আছে কিনা—দুরভিসন্ধি থাকলেও থাকতে পারে তো!

ডাক্তার ভাবে—চেহারায় আবছা আবছা কতকটা মিললেও ব্যবহার অতি যাচ্ছেতাই। এ পজনের প্রাণে যে প্রেমের ছিটেফোঁটা আছে, তা বিশ্বাস করতে পারা যায় না। প্রেমের জন্যে যে এ লোক মরতে যেতে পারে সেটাও স্বপ্ন। সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞান নেই। কে কিরকম মানুষ তাও চেনবার ক্ষমতা নেই। খালি সন্দেহ, সন্দেহ! সন্দেহের ডিপো একটা।

ডাক্তার একদৃষ্টে দেখছে ইন্সপেক্টরের পা থেকে মাথা অবধি। চটে যায় ইন্সপেক্টর,

—কী দেখছেন কী এতো? এ্যারেস্ট করবো এখুনি বলে দিচ্ছি—যদি না আপনি নিজের বিষয়ে, আপনার জানবার বিষয়ে নিঃসন্দেহ করতে পারেন। আর এক মিনিট টাইম দেওয়া হবে আপনাকে।

ডাক্তারের চমক ভাঙে।

তার স্বাভাবিক বিনয়ের সুর ঝরে পড়ে কথায়,

—কিছু মনে করবেন না, ক্ষমা করবেন! আপনারই শুভ নাম কী পজনলাল?

—হ্যাঁ। জলদি, জলদি···।

—আচ্ছা, আপনার লাহোরে—আনারকলি বাজারে বা—

বাধা দিয়ে বলে ওঠে পজন, হ্যাঁ বাড়ি ছিলো, তাতে হয়েছে কী? সে আমার পূর্বজন্মের কথা, তার সঙ্গে এ জন্মের কী সম্পর্ক?

—হীরকে চিনতেন?

—হীর! হীর! হীর!

পজনের হাতের পিস্তল খসে পড়ে যায়। ক্ষেপে ওঠে পাগলের মতো—রক্তচক্ষু। ডাক্তারকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে যেন এখুনি। ডাক্তার অবাক। হিংস্র শ্বাপদ বেরিয়ে এসেছে পজনলালের ভেতর থেকে। ভীষণ মূর্তি। ডাক্তারের জামার কলার মুঠো করে ধরে ঝাঁকুনি দিলে পজন—কে তুই শিগগির বল! আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, আমায় মারতে এসেছিস, ডাকাতি করতে এসেছিস, চোরাকারবার করতে এসেছিস! আমি কিছুতেই শুনবো না। চল্ চৌকিতে!

এক নিশ্বাসে বলে থেমে যায় পজন। হাঁপিয়ে ওঠে।

আবার গর্জে উঠলো পজন,

—হীর বেঁচে আছে? মরে নি!

পজনের সমস্ত শরীর রাগে ফুলে উঠলো দ্বিগুণ। ঠাস করে ডাক্তারের গালে চড় বসিয়ে দিলে।

ডাক্তারের নীরব প্রতিবাদ। কী বলবারই বা আছে তার? কতোখানি আঘাত জমা পজনের বুকে, তার তুলনায় ডাক্তারের চড়চাপড়ের আঘাত কিছুই নয়।

ডাক্তারের পরিচয় নেওয়া হয়ে গেলো—হ্যাঁ, এই সেই পজন। শান্তভাবেই ডাক্তার বললে,

—স্থির হন পজনলালজী! হীর বেঁচে আছে, তাকে চান দেখতে? দেখাতে পারি।

ফেটে পড়লো পজন,

—সোয়াইন, বাস্কেল! হট্ যাও! হট্ যাও মেরে আঁখোকে সামনে সে! আমি জানি, সে নেই। সে আমার চোখের সামনেই—নিশ্চয় ওকে ওরা মেরে ফেলেছে পরে।

—দুচোখে হাতচাপা দিয়ে শিশুর মতো কেঁদে ওঠে। ডাক্তার সস্নেহে পিঠে হাত বুলোতে থাকে।

—বিশ্বাস করুন! হীর বেঁচে আছে। আমি আপনার কাছে নিয়ে আসতে চাই।

—বেঁচে আছে সত্যি? সত্যি আমার মতো তাহলে সে বেঁচে গেছলো! কোথায় আছে সে?

—আমারই কাছে।

আমার পরিচয়টা দিয়ে নিয়ে, তিনি কী ভাবে আমার কাছে এসেছিলেন—সব জানাচ্ছি।

ডাক্তারের মুখে শাফ্‌ম্নিসার সমস্ত কথা শুনে, পজন ডাক্তারের হাত দুটো বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বললে,

—বলুন ডাক্তার, যা অন্যায় করেছি আপনার ওপর, যা অবিচার করেছি যা তা বলে—সব ক্ষমা করলেন?

ডাক্তারের চোখ সজল হয়ে ওঠে। গলায় স্বর বেরোয় না

কেবল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়—হ্যাঁ, ডাক্তার ক্ষমা করেছে—কিছু মনে করেনি।

—ডাক্তার, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, হীর বেঁচে আছে, তাকে পাবো হয়তো। কিন্তু তবুও মনে দ্বিধা আসছে—দ্বন্দ্ব আসছে—এও কী সম্ভব?

স্বপ্নের অগোচর যা, কল্পনার অতীত যা,—তা সত্যি হতে পারে?

—হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর! সবই সম্ভব হয়। ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ইম্যাজিনেশন!

—ডাক্তার আপনি জানেন না, সেদিন যে কী দিন গেছলো! সে ঘটনা শুনলে বুঝতে পারবেন। এরপরও মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারে কেমন করে।

সেদিনকার সে দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলে, আমি পাগল হয়ে যাই। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে আমার। আমারই সামনে আমার হীরকে—উঃ।

—জানি, সব শুনেছি। আপনি স্থির হোন।

—ডাক্তার! তাকে পারিনি রক্ষে করতে! শয়তানদের হাতে তুলে দিতে হয়েছিলো। এমনিই পুরুষ আমি! জানেন না ডাক্তার, কতো কতো যন্ত্রণা জ্বলছে আমার বুকে। আগ্নেয়গিরির লাভা-স্রোত বইছে দিনরাত।

মজনু-আমি, দুজনেই হেরে গেলুম—হীরের ইজ্জত-সম্ভ্রম বাঁচাতে পারলুম না।...তারপর জানিনে আর কিছু।

জ্ঞান হতে দেখলুম, মেয়ো হসপিটালে! পাশের বেডে মজনু। তখনো জ্ঞান হয়নি তার।

হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে পজন।

মজনুর জ্ঞান আর এলো না—আমার জন্যে, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মজনু প্রাণ হারালে।

আমার বেডের সামনে ডাক্তার-মৌলবীসাহেব বসে থাকতেন

মাঝে মাঝে। সব আহতদের কাছে যেতেন, বসতেন তিনি, তবে আমার কাছে একটু বেশী। তিনিই মজনুকে-আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে হসপিটালে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে খাওয়াতেন, নিজে ইনজেকশন দিতেন। মানা করে দিয়েছিলেন, আমি যেন কারো হাতে না খাই, কারো ইনজেকশন না নিই, অন্যকে দেখলে বিকারের ভান করে পড়ে থাকি। ইনজেকশনে খাবারে নাকি বিষ মেশানো হচ্ছে।

মৌলবীসাহেবের কথা মতোই আমি কাজ করে যেতুম। একটু ভালো হলেই তিনি আমায় লুকিয়ে, অমৃতসরের প্লেনে তুলে দেন!

পজনের একটা দীর্ঘনিশ্বাস সীমান্তে শত নিশ্বাস হয়ে ঝরে পড়লো।

পজন ছলছল চোখে, আবেগ জড়ানো গলায় বলে যেতে লাগলো,

—কী স্নেহ তাঁর! তিনি মৌলবী হয়েও ডাক্তার হয়েছিলেন গরীবদের জন্যে।

মেয়ো হসপিটালে তখন নার্স—ডাক্তারেরা পালিয়েছে। মৌলবী-সাহেবের কী আপ্রাণ চেষ্টা সকলকে ভালো করে তোলবার। হিন্দু-মুসলমানকে সমান ভাবে তাঁর স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন সেদিন।

জানিনে তিনি আজো বেঁচে আছেন কিনা। তাঁর মায়ের মতো স্নেহ-মমতা ভোলবার নয়।

মৌলবীসাহেবের উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকালে পজন। নমস্কার জানালে।

হীরকে হারিয়ে আসতে হল। প্রাণ দিয়ে এলুম লাহোরে। দেহটাকে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

অনেক যোগাড়যন্ত্র করে ইন্সপেক্টরি পোস্টে সীমান্তে এলুম।

সামান্তে আসার উদ্দেশ্যই ইন্সপেক্টরি পোস্টে ঢোকা। এখানে রাতে যখন আসি—দূরে চেয়ে দেখি—ওপারে সেই আগের পজন আগের হীর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার অজান্তেই যখন-তখন চলে আসি আমি। যখন শুনি মেয়ে চুরির ব্যাপার, তখন আমার মাথায় দপদপ করে জ্বলে ওঠে আগুন। চোখের সামনে দেখি, হীরের নির্যাতনের ছবি। আমি পাগল হয়ে যাই। সেপাইদের যা তা বলে বসি। অর্ডার দি—চ্যালেঞ্জ না মানলে ফায়ার। লোকে আমার ব্যথা বোঝে না। তারা ভাবে আমি অবুঝ, আমি দুর্দান্ত, আমি নিষ্ঠুর।

ডাক্তার পজনের কথা শুনতে শুনতে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। যেন ম্যাডামের কাছে বসে শুনছে—পজন-হীরের প্রেমকাহিনী।

দড়াম দড়াম আওয়াজে সম্বিত ফিরে পেলো পজন ডাক্তার।

বিষাদের হাসি পজনের চাপা ঠোঁটে। ডাক্তারের হকচকিয়ে যাওয়া দৃষ্টির জবাব দেয় পজন,

—নিত্যি এই ঘটনা। কখন কোন সময় এসে পড়ি, তাই সেপাইয়ের কাজ দেখানো—গোপনে লোক আসা যাওয়াকে শাসানো —ভয় পাওয়ানো ফায়ার—ফাঁকা আওয়াজ।

সচকিত হয়ে উঠে পজন,

—সীমান্তে এ ভাবে যাওয়া আসা বে-আইনী ডাক্তার!

—প্রাণের মিলনও কী আইনের আওতায় পড়ে ইন্সপেক্টর সাহেব?

ইন্সপেক্টর নিরুত্তর।

অন্ধকারে গাছের আড়ালে-আবডালে গাঁয়ের কোলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো ডাক্তার।

পজন একভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো খানিক। কী যেন একটা স্বপ্ন দেখছিলো সে এতক্ষণ। হঠাৎ চনমনে হয়ে ওঠে—সেপাইরা ঝিমিয়ে পড়েছে কিনা, ঘুমুচ্ছে কিনা, কী করছে তারা।

পজনের সজাগ দৃষ্টি সীমান্তে সেপাইদের পাশ দিয়ে দিয়ে চলেছে! মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে—ওপারে আটকে পড়েছে—হীর! হীর!

সেপাইদের বুক ধড়ফড়, গা থরথর—ধরে ফেলে বুঝি চোরা-কারবারীদের আপদ!

নীল ডিমলাইট জ্বলছে। দুপাশে চেয়ার মাঝে টেবিল। মুখোমুখি বসে ডাক্তার আর শাফ্রুন্নিসা।

ডাক্তারের চোখে প্রশান্তি নেমে আসছে। শাফ্রুন্নিসার চোখে দারুণ ভীতি-বিস্ময়।

—কী বলছেন ডাক্তার?

দেয়াল ঘড়িটা টক টক করে চলছে। ডাক্তারের নিশ্বাসেব শব্দ উঠছে ট্রথ ট্রথ ট থ।

শাফ্রুন্নিসার নিশ্বাসে শব্দ উঠছে ঠগ-ঠগ-ঠগ। শাফ্রুন্নিসা ডাক্তারের কথা সত্যি বলে মেনে নিতে পারছে না, তার বিশ্বাস—ডাক্তার কোন ঠগ-জোচ্চরের পাল্লায় পড়েছে। কিংবা হাফিজ জানতে পেরেছে শাফ্রুন্নিসা এখানে, তারই ষড়যন্ত্র কিনা কে বলতে পারে! শেষে ডাক্তার না কোন বিপদে পড়ে কারো কথা শুনে।

যে আঘাত পেয়েছে শাফ্রুন্নিসা তার জীবনে, এখন সত্যিকেও সত্যি বলে মানতে বাধে—ভয় হয়। তার তকদির—অদৃষ্টে সত্যিও মিথ্যে হয়ে পড়ে।

শাফ্রুন্নিসার ভয় হয়। ওই মতলব করে, হাফিজ যে সীমান্তে বিপদে ফেলবে না তাই বা কে হলপ করে বলতে পারে?

—ডাক্তার এ সব ঝঞ্ঝাটে যাবেন না! আমার চোখের সামনে পজন —। আর বলতে পারে না শাফ্রুন্নিসা!

—ম্যাডাম!

—ডাক্তার এটা বুঝছেন না কেন? ভুলে যাচ্ছেন কেন? রেজাক শয়দার ভাই। আপনিই বলেছিলেন, শয়দা হাফিজের বন্ধু! ওই আপনাকে হাফিজের বাড়ি নিয়ে গেছলো। আমি বিশ্বাস করিনে ডাক্তার, কোথা থেকে কী বিপদ আসে···!

—কী বলছেন ম্যাডাম? প্রকৃতিস্থ হন! চিন্তা করে দেখবেন পরে। এ কারো কথা নয়। এ আমি নিজে গিয়ে চোখে দেখে এসেছি, কথাবার্তা কয়ে এসেছি।

শার্ফুন্নিসা সব শুনলে! স্তব্ধ হয়ে গেলো। কেটে গেলো কিছুক্ষণ। দুজনের মুখেই কোন কথা নেই। একেবারে চুপচাপ। নিঃশব্দে নিশ্বাসের শব্দ উঠছে দুলে দুলে।

শার্ফুন্নিসা ডাক্তারের চিন্তায় ডুবে যাচ্ছে।

—ডাক্তারকে বাঁচাতে হবে। যদি কোন দিন হাফিজ জানতে পারে—ডাক্তারকে দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে না কখনো। ডাক্তারকে মেরে ফেলতে চায় না শার্ফুন্নিসা। শার্ফুন্নিসা নিজে মরুক।

শার্ফুন্নিসা নিস্তব্ধতা ভাঙলো, কথা কইলো।

—বেশ, আমায় নিয়ে চলুন! যেতে প্রস্তুত। আরো একবার না-জানা ভবিষ্যতের সঙ্গে না হয় শেষ লড়াই করবো।

ডাক্তারের চোখে খুশীর ঝিলিক মারে—সঙ্গে সঙ্গে ঘন বিষাদও নেমে আসে—চোখ দুটো জলে ডবডবে হয়ে ওঠে।

পজনকে দেখতে মন চায় শার্ফুন্নিসার। আকুলি-বিকুলি বেড়ে ওঠে। ছুটে যায় পজনের কাছে উন্মত্ত মন।

ফিরে আসে আবার ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার নিঃসহায়! কে দেখবে—কে আছে! ডাক্তার কী ভাবে থাকবে? কৃষ্ণভামিনী মারা যাবার পর, ডাক্তার সে ছাড়া যে আর কিছু জানে না। কোন বন্ধু-বান্ধবও নেই।

সারারাত চোখের পাতায় ঘুম নেই শাফ্‌র্ন্নিসার।

সকালে, শাফ্‌র্ন্নিসার চোখেমুখে রাতজাগার মলিনছোঁয়া দেখে ঘাবড়ে যায় ডাক্তার।

—পজনের কাছে যেতে হবে, ম্যাডামের কতো আনন্দ হওয়া উচিত, তা নয়—উল্টোটা দেখবে, আশা করেনি।

ডাক্তারেরও রাতজাগা অবস্থা—ম্যাডাম গেলে ডাক্তার বাঁচবে কী করে! তা হোক, তবু ম্যাডাম সুখী হবেন তো! আহা! মধুর মিলন হোক ওঁদের!

ডাক্তার বলছে শাফ্‌র্ন্নিসাকে—পজনজী কাঁদেন। প্রতি রাতে দেখেন তাঁর হীর তাঁকে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

শাফ্‌র্ন্নিসারও ঠিক তাই ভাব। পজন তার মনে জীবন্তই হয়ে আছে এতোদিন—হারায় নি। রোজ গানের মধ্যে দিয়ে ধ্যানে টেনে আনে পজনকে শাফ্‌র্ন্নিসা।

ডাক্তার বারে বারে অনুরোধ করছে শাফ্‌র্ন্নিসাকে—পজনজীর সঙ্গে অন্তত ম্যাডামের একবার দেখা করা উচিত। পজনজী ম্যাডামের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

শাফ্‌র্ন্নিসাও ডাক্তারকে কথা দিয়েছে পজনের কাছে যাবে। তবুও—

কানমাথা ভোঁ ভোঁ করে ওঠে শাফ্‌র্ন্নিসার। শাফ্‌র্ন্নিসার মৃত্যু হয় হোক। শাফ্‌র্ন্নিসা তো অনেক দিন আগে মরেছে—হাফিজের বাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু শীরী যেন না মরে—ডাক্তারের বাড়ির শীরী। পজনের হীর বাঁচুক—কিন্তু ডাক্তারের শীরী মরে গিয়ে নয়! এমন হতে পারে না—দুটো এক সঙ্গে বেঁচে থাকে—শীরী আর হীর!

ডাক্তার এসে ঘরে ঢোকে। শাফ্‌র্ন্নিসাকে গভীর চিন্তিত দেখে বললে,

ম্যাডাম? এত দুশ্চিন্তা কিসের?

শাফ্‌র্‌ন্নিসা নিজেকে সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেলে। কাঁপা গলায় বলে,

—হীর বাঁচুক দুঃখু নেই। কিন্তু শীরী—

ডাক্তারের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে। জমাট ব্যথা চেপে রাখে—মুখ খুলতে দেয় না। মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

—না, ডাক্তারেব এখান থেকে কোথাও যাবে না শাফ্‌র্‌ন্নিসা। হীর নামটার ওপর এতো বিতৃষ্ণা এসে গেছে—শুনলেই ঘেন্না আসে—গা জ্বালা করে ওঠে। কোথায় আজ সে হীর ? প্রথম জীবনে হীর, পজনের হীর তো মরেছে '৪৭ সনের দাঙ্গায়। ডাক্তার কেন বাঁচাতে চেষ্টা করছেন মরা হীরকে—পজনের হীরকে ? হাফিজের বাড়ির মরা শাফ্‌র্‌ন্নিসা গিয়ে, ডাক্তারের বাড়ির জ্যান্ত শীরী গিয়ে, কেমন করে হীরের আসন নিতে পারে পজনের কাছে ? ডাক্তার কিছু বোঝেন না ?

জিজ্ঞেস করলেই, ডাক্তারের ঠোঁটের আগে যোগান দেওয়া একই জবাব শুনতে হয়—হীরের সেই পজনই বেঁচে আছেন, এখনো মরেননি, মরবেন না কখনো। ডাক্তার নাকি দুদিকেই যাচাইয়ের পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন—হীর-পজনের মিলন সেতু তাঁকে বাঁধতেই হবে।

কদিন মনের তোলপাড়ানি, ডাক্তারের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত থামতে বাধ্য হল। শাফ্‌র্‌ন্নিসাকে ডাক্তারের সঙ্গে বেরুতে হল।

মোটর-টাঙার পাট চুকিয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলো ডাক্তার আর শাফ্‌র্‌ন্নিসা। চলার পথে জিজ্ঞেস করলে কেউ কেউ গাঁয়ের লোক—সাহব, বেগমসাহেবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে! এই পাশে এখান থেকে আর একটু দূরে বেগমসাহেবার রেস্তেদারের জ্ঞাতির অসুখ কিনা, ইত্যাদি নানান জবাব দিয়ে দিয়ে চলতে থাকে ডাক্তার। গাঁয়ের লোকেদের মনে সন্দেহের ছায়া পড়ে না। হবে বা—তা না হলে গাঁয়ের ভেতর সাহব-বেগম আসবে কেন ?

কোনো গাঁবাসী অনুরোধ করে আবার, সঙ্গে যাবে কী, কিছু মদত করবে কী? ডাক্তার ঘাড় নাড়ে। দু-একজন মেহেমানদের রাখবার জন্যেও উৎসাহী—রাতটা থেকে গেলে হত না তাদের গরীবখানায়! ডাক্তার হাসিমুখে সবার প্রশ্ন-অনুরোধ এড়িয়ে যায়!

গাঁবাসীদের সরলতায় মুগ্ধ হলেও শার্ফুন্নিসার সন্দেহ জাগে—ভয় হয়। ডাক্তারকে ফিসফিসিয়ে বলতে থাকে—এরা বুঝতে পারছে না তো কিছু? হাফিজকে খবর দেবে না কেউ? হাফিজের লোক ওরা নয়তো?

ডাক্তার স্বভাব সুলভ মিষ্টি হেসে বলে—কোন ভয় নেই ম্যাডাম। এখান দিয়ে রেজাকের সঙ্গে গেছি এসেছি। নিজেও একলা যাওয়া আসা করেছি। মুখ চেনা হয়েছে এদের সঙ্গে। এরা অন্য কিছু ভাবতে পারে না। সহুরে ঘোরপ্যাঁচ এদের মধ্যে অতোটা নেই।

এইভাবে ওরা সীমান্ত গাঁ শান্তপুরায় ঢুকলো। ঘুমের রাত্তির তখন চারদিকে নিবিড় জাল বিছিয়ে দিয়েছে। গাছ-গাছালিরা জেগে রয়েছে কেবল। তাদের সুখ দুঃখের কথা কানাকানি করছে। রাতের ঝিমুনিঢুল সীমান্ত প্রহরীদের চোখে নেমে এসেছে।

বোরখা ঢাকা শার্ফুন্নিসা চলেছে ডাক্তারের সঙ্গে—কোথাও আস্তে, কোথাও পা চালিয়ে জোরে জোরে, কোথাও একেবারে দমবন্ধ করে। আতঙ্ক পথের পরিশ্রম সব কিছু অগ্রাহ্য করে দ্বিগুণ উৎসাহে চলেছে ডাক্তার।

ডাক্তারের মন আনন্দে ভরপুর। তার ম্যাডাম, তার শীরীকে—পজনের হীরকে আজ তুলে দেবে সে পজনের হাতে। নতুন ভাবে গড়ে উঠবে হীর-পজনের জীবন। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কৃষ্ণভামিনীর ছবি—উজ্জ্বল ভরসা দেওয়া দুটো চোখে মা চেয়ে আছে। ম্যাডামের শূন্যতা ভরে দেয় কৃষ্ণভামিনীর হাসিমুখী জীবন্ত ছবি।

বোরখার ভেতর শাফু্ন্নিসার হৃৎপিণ্ড দুধার থেকে দুটো সবল হাত চেপে ধরে নাড়া দিচ্ছে—পজনকে দেখবার—পাবার সুখানুভূতি আর ডাক্তারকে ছাড়বার বেদনা।

মার্চ করতে করতে সেপাই আসছে—রুদ্ধশ্বাসে গাছের আড়ালে গুঁড়িমেরে বসে রইলো ওরা। ডেয়োপিঁপড়ের অসহ্য কামড়ে সর্বাঙ্গ ফুলে উঠলো। সেপাই চলে গেলো। ওরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আবার চলেছে ওরা ওদের যন্ত্রণাকাতর দেহটাকে টেনে নিয়ে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হল ঝোপের পেছনে। দূরে চোখ ঝলসানো প্রখর আলো এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

শাফু্ন্নিসার মন উথালপাতাল। বুক ঢিবঢিপুনি বেড়ে উঠলো—এতো কাছে এসে শেষ সীমানায়, পজনকে দেখতে পাওয়া গেলো না! ধরা পড়লে কী কেলেংকার! কী কেলেংকার! কী বেইজ্জতি! শাফু্ন্নিসার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

এগিয়ে আসে তেজালো আলো। নিঝুম নিশুতি রাত দিন হয়ে যায়। এ আলোর কাছে ঘুটঘুটে আন্ধকারের অস্তিত্ব লোপ পায়। গলা শুকিয়ে ওঠে শাফু্ন্নিসার—ঝড়ের বেগে কানফাটা বুকফাটা আও-য়াজে মিলিটারী ট্রাক এগিয়ে আসছে। রাইফেল উঁচিয়ে এপাশ-ওপাশ শ্যেন দৃষ্টি ফেলছে টুপিপরা মুখ কটা।

শাফু্ন্নিসার চোখে ঝলসনো আলোতে সব অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো—আর নিস্তার নেই। এদের কারো নজরে পড়লে কী যে হবে কে জানে। তবুও ওপারে ধরা পড়লে পজনকে দেখতে পাবার সুযোগ থাকতো, এপারে শোচনীয় অবস্থা। কল্পনা করতেও বুক কেঁপে ওঠে। শিউরে উঠলো শাফু্ন্নিসা।—কী দুঃসাহসী কাজ করে ফেলেছে ডাক্তার!

ডাক্তারও দেখছে বিপদ আসছে। কিন্তু অসীম মনের জোর তার। একটুও বিচলিত নয়। শাফু্ন্নিসাকে আড়াল করে শুয়ে রইলো মাটিতে মিলিয়ে। মরার মতো।

রাক্ষুসে ট্রাক সামনে পেছনে চারপাশে ধুলোর কুয়াশা সৃষ্টি করে, হুস করে বেরিয়ে গেলো—ওদের নাকে মুখে ধুলোর ঝাপটা মেরে।

যাক, বাঁচা গেলো! একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার চলা শুরু করে ওরা।

শার্ফুন্নিসা ক্লান্তিতে ডুবে যাচ্ছে। চলতে পারছে না আর। ডাক্তার কোনো প্রকারে তার অবসন্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। শার্ফুন্নিসা সমস্ত শরীরের ভার ক্রমে এলিয়ে দিলে ডাক্তারের দেহে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জল নেই ধারেকাছে। ধূ-ধূ করছে মাঠ।

ডাক্তারের অস্থিরতা বেড়ে ওঠে। আর একটু—কাহানগড়। শার্ফুন্নিসার কানে কোনো কথা যাচ্ছে না। অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে শার্ফুন্নিসা—নিঃসীম অন্ধকারে।

মহা বিপদে পড়লো ডাক্তার। শার্ফুন্নিসাকে একলা রেখে জলের চেষ্টা করাটাও বোকামি। এমন জায়গায় এসে পড়া গেছে—যে কোনো মুহূর্তে অঘটন ঘটে যেতে পারে একটা। অসহায় নিরুপায় ডাক্তারের মাথায় হঠাৎ একটা মতলব খেলে গেলো—জলের বদলে রক্ত অষ্ট্রেলিয়ার উপজাতিরা তো তাই করে। নির্জলা জায়গায় পিপাসাকাতর হলে বন্ধু বন্ধুর রক্তের শিরা কেটে দেয়। রক্ত খেয়ে শক্তি পায়। তেষ্টার ক্লান্তি চলে যায়।

রুমাল দিয়ে কনুইয়ের ওপর টাইট করে বেঁধে নিলে ডাক্তার। শার্ফুন্নিসার চুলের কাঁটা দিয়ে ফুলে ওঠা শিরা বিঁধে বিঁধে ছেঁদা করে, শার্ফুন্নিসার মুখে ধরলে রক্তের ধারা। শার্ফুন্নিসা আস্তে আস্তে চোখ খুললে! ডাক্তারের কাণ্ডকারখানায় হতভম্ব হয়ে গেলো।

—মরতুম না হয় ডাক্তার! তার জন্যে আপনার শরীরটা দুর্বল করা কী উচিত হল?

—না, ম্যাডাম। কাটাকোটায় ওরকম কত যায়। ভয়ের কিছু নেই। আমি ঠিক আছি। আপনার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

হাসলে শার্ফুন্নিসা—এতোতেও যদি···।

শার্ফুন্নিসার পিপাসা মিটলো, কিন্তু অবশ পা আর উঠতে চাইছে না। ডাক্তারের কাঁধে ভর রেখেও না। আর এ জায়গায় অপেক্ষা করতে পারা যায় না এক মুহূর্তও।

ক্ষমা করবেন ম্যাডাম! ডাক্তার শার্ফুন্নিসাকে তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে। সীমানা পার হয়ে কাহানগড়ে এলো ওরা।

কিসের যেন একটা আওয়াজ। চমকে উঠলো ডাক্তার, শার্ফুন্নিসাকে নামিয়ে রাখলে। চারদিক দেখতে লাগলো, কোথাও কেউ লুকিয়ে আসছে নাকি ওদের পেছনে? একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলা ভালো।

শার্ফুন্নিসা ভয় জড়ানো গলায় বললে,

—দূরে গাছটা যেন নড়ছে না? ডাক্তার আকাশ-আলোর আভায় দেখতে থেলো—সত্যিই। শার্ফুন্নিসা যা বলেছে—গাছটা নড়ে নড়ে উঠছে। ডাক্তার ভাবে পজন কী তাদের দেখে ইঙ্গিত করছে? তা কেমন করে হয়? তার সঙ্গে যে আরো দূরে দেখা হবার কথা।

পাখীর ঝাঁক চীৎকার করে উঠলো। অন্ধকারে ডানা ঝটপটিয়ে উড়োউড়ি করতে শুরু করে দিলে। একটা ভয়ের ছায়া বিছিয়ে গেলো সীমান্তভূমি জুড়ে!

শার্ফুন্নিসার চোখে সন্দেহ—কেউ আছে ওখানে নিশ্চয়!

ডাক্তারের অনুসন্ধানী দৃষ্টি—যদি কেউ থাকে—সে জানান দেবে এই ভাবে?

হঠাৎ শার্ফুন্নিসার বোবা-চোখ আর কেঁপে ওঠা আঙুলের ইশারা দেখে ডাক্তার স্তম্ভিত। গাছ থেকে একটা প্রকাণ্ড সাপ সড় সড় করে নেমে যাচ্ছে।

শাফু্র্ন্নিসার কাঁপা হাত চেপে ধরে ডাক্তার।

—ভয় কী ম্যাডাম! ওধারে চলে যাচ্ছে সাপটা। আমাদেরও চলার শেষ হয়ে এলো এবার। আর সামান্য। উৎসাহে-আনন্দে নেচে ওঠে ডাক্তারের বুক। ঐ দেখা যাচ্ছে—পজন দাঁড়িয়ে ওই জায়গাতেই সেদিন কথা হয়েছিলো অনেক। ওখানেই নিশানা করা ছিলো আমাদের আসবার। আর কোনো ভয় নেই।

শাফু্র্ন্নিসা দ্বিগুণ শক্তি ফিরে পেলে।

—ডাক্তার এটুকু আমি বেশ যেতে পারবো।

শাফু্র্ন্নিসার মনে হচ্ছে কতোক্ষণে পজনের কাছে পৌঁছয়—পাঁচ মিনিটের পথ যেন পাঁচ ঘণ্টা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার কাছে।

পজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিটি মুহূর্ত গুণছে। এক এক মুহূর্ত যেন এক একটা হতাশার কামড়ে অস্থির করে তুলছে। যতো দেরী হচ্ছে—সন্দেহ ততো দানা বাঁধছে।—তবে কী লোকটা ছদ্মবেশী চোরাকারবারী! অনেক কিছু খবরটবব নিয়ে, উল্টো চাল মেরে গেলো! ওর কাজ ফতে করে নিয়ে, মুখের ওপর জুতো মেরে, টেক্কা দিয়ে গেলো! অসম্ভব সম্ভব কেমন করে হবে? সে বেঁচেছে বলে, হীর বাঁচতে পারে না, জানে পজন তবু কী দুর্বলতা! যাকে মানুষ ভালোবাসে, তাকে হারিয়েও হারাতে চায় না। কল্পনা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে!

পজনের চোখ দিয়ে অন্ধকার রাতেও আগুন ঠিকরে পড়তে থাকে। তার বুকে আগুন মাথায় অগুন। নিশ্বাসেও আগুনের হলকা।

—এবারে কোনোদিন নজরে পড়লে হয় বাছাধন! পজনকে ঠকানো! এ শ্যেন দৃষ্টি থেকে একবার পার পেয়েছে। দ্বিতীয় বারে আর নয়! আর বোকা বনছে না পজন। মিথ্যে অভিনয়ে ভুলছে না।

আসছে না কে? পজন রিভলবার বার করে নেয়। তাক করে দাঁড়ায় সোজা।

সঙ্গে বোরখা পরা মেয়ে! হীর বোরখা পরবে কেন? তবে কী মেয়ে চুরি, বোরখা ঢাকা দিয়ে! এই ব্যাটাই মেয়ে চুরির সঙ্গে যুক্ত আছে নির্ঘাৎ। কোনো রকমে ক্ষমা নয়।

—কে?

—বন্ধু!

—আসুন!

এগিয়ে আসছে আসুক। পজনের মাথা খারাপ হয়নি এখনো। সে হীরকে চিনতে পারবে। অন্য মেয়ে দেখিয়ে তাকে ভুলোনো যাবে না। বশ করা যাবে না। কার্যসিদ্ধি হবে না ধড়িবাজের।

মুখের বোরখা খুলে ফেললে শার্ফুন্নিসা।

—একি, হীর! সত্যিই হীর! হীর তুমি?

পজন কাছে দৌড়ে এলো।

হীরও দেখছে সত্যিই পজন।

—পজন! পজন! আছড়ে পড়লো পজনের বুকে পরিশ্রান্ত হীর। দুজনের চোখে আনন্দের বন্যা—হারিয়ে যাওয়াকে ফিরে পাওয়ার অপরিসীম পরিতৃপ্তি। বোবা খুশীতে ডাক্তারের চোখের পাতা ভিজে গেলো—চিক চিক করে উঠলো।

ডাক্তারের দিকে মুখ ফেরালো হীর। পজনকে ভেজা গলায় বললো।

—ডাক্তারের জন্যেই আজ আমরা মিলতে পেরেছি।

—ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরলো পজন।

—বন্ধু, চিরকৃতজ্ঞ আমি আপনার কাছে! চিরঋণী। গোলামকে ক্ষমা করুন!

ডাক্তার পজনের হাত দুটো ধরে বললো।

—বন্ধু ঋণী আমিও আপনার কাছে—আপনার মহৎ হৃদয়ের

কাছে—আপনার প্রেমকে যত্ন করে রাখার ক্ষমতা কাছে। বিদায় বন্ধু! বিদায় ম্যাডাম!

হীরের কণ্ঠ কেঁপে ওঠে।

—পজন! আমি তোমার অযোগ্য। সে হীরকে তুমি আব পাবে না!

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে পজন।

—সেকি হীর? তুমি আমার সেই হীর! তোমার চেয়ে আর কে যোগ্য আছে আমার!

—হাফিজেব ঘরে—

—শুনেছি ডাক্তাবের মুখে। তোমাব মুখে শুনতে কিছু চাইনে হীর! আমি জানি—তুমি শুদ্ধ পবিত্র সুন্দর। অনিচ্ছার ঘটনা—দুর্ঘটনা। তার জন্যে দায়ী তুমি নও। দায়ী আমি। রক্ষে করবাব দায়িত্ব আমাব। দোষী আমি। তুমি নির্দোষ।

পজন হীরকে বুকের কাছে টেনে নিলে।

ডাক্তারের সর্বহাবা কণ্ঠ বলে উঠলো আবার—

—বিদায় ম্যাডাম! বিদায় দোস্ত!

হীর নির্বাক। খালি কেঁদেই চলে সে অব্যক্ত মর্মছেঁড়া ব্যথায়।

পজন হাত নেড়ে বলতে লাগলো।

—সুক্রিয়া ডাক্তার! বহুত, বহুত সুক্রিয়া! হীরের বুকের এক দিকেব পাঁজর মটমট কবে ভেঙে, কে যেন একটা ফুসফুস কেটে বার করে নিয়ে গেলো।

ডাক্তারের পা টলছে। সে দেখছে কৃষ্ণভামিনী—হীর। হীর—কৃষ্ণভামিনী। তার চোখের সামনে চলছে দুলছে ঘুরছে। চলতে পারছে না আর ডাক্তার—পেছন দিকে পা টানছে কে। সামনে এগুতে দারুণ কষ্ট। কোন পথে যেতে কোন পথে যাচ্ছে তাও খেয়াল নেই ডাক্তারের। তবু তাকে যেতে হচ্ছে, যেতে হবেই।

এলোমেলো পা ফেলে সীমারেখা ধরেই ঘুরছে ডঃ তমীশ মুখার্জী।

একটু ঘূর্ণিবাতাসের মধ্যিখানে যেন পড়ে গেছে। উঠতে পারছে না, বেরোতে পারছে না। না পারছে ওপারে যেতে, না পারছে এপারে ভেতরে চলে আসতে। ছুনিয়ার সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। নিজেকেও বুঝি বা হারিয়ে ফেলছে।

নজর সিং এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে একদৃষ্টে। শয়তান মদে টর। চ্যালেঞ্জ করছে—কে তুমি?

কোন জবাব মেলে নি।

লোকটা নিশ্চয়ই চোরাকারবারী—গোপন চালান মহলের কেউ না কেউ হবে। এখনো রাইফেলের রেঞ্জের ভেতরে রয়েছে। অন্য সেপাইদের মতন ইন্সপেক্টর সাহেবের কাছে বেইমান হতে পারবে না নজর সিং কিছুতেই। সাহব কত না বিশ্বাস করে বলেছে তাকে—তোমার কর্তব্য সীমান্তের বুক মাড়িয়ে কেউ যেন না অন্যায়ের ব্যাপারী হয়ে পালিয়ে বাঁচে। তোমার ওপর পুরো দায়িত্ব দিলুম আমি।

চোখের তারা দেখে ইন্সপেক্টর বুঝছে—নজর সিং যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বলেছে, কারো কাছ থেকে কোন কিছু পাবার লোভ-লালসা তোমার নেই ওদের মতন। আমি জানি নজর, তোমার নজর ঠিকই কাজ করে যাবে। তেমন দরকার হলে এতটুকু দ্বিধা করবে না ফায়ার করতে।

সীমাপরিসীমাহীন আনন্দে নেচে উঠেছে নজর সিং-এর বুক। সাহেবকে দেখিয়ে দেবে আজ সে কত বড় বিশ্বাসী কত বড় অনুগত। কত বড় কর্তব্যে অটল সেপাই। সাহেব খুশী হবে তার কাজ দেখে। সে ইনাম পাবে। প্রমোশন হবে।

টিপে ধরলো ট্রিগার।

দড়াম্ দড়াম্ দড়াম্।

কেঁপে উঠলো সীমান্তভূমি।

হো-হো করে হেসে উঠলো নজর সিং। অব্যর্থ লক্ষ্য তার। শিকারীর হাত থেকে শিকার ফসকায়নি, লুটিয়ে পড়েছে।

বন্দুকের শব্দে আর্তনাদে করে উঠেছে হীর দুহাতে নিজের বুক চেপে ধরে। তার হৃৎপিণ্ডটা বুলেটের ঘায়ে টুকবো টুকরো করে দিলে বুঝি কে পাষাণ!

বুকফাটা কান্নায় আকাশ-বাতাস কেঁদে উঠলো হীরের সঙ্গে। বোরখা পরা হীর ছুটে এসে আছড়ে পড়লো ডাক্তারের বুকে।

নজর সিং-এর প্রমোশনের উল্লাস বেড়ে বেড়ে আকাশছোঁয়া হয়ে উঠলো নিমেষে। একেই বলে নসিব। একসঙ্গে দুটো ধরা পড়ে গেলো। মেয়েটাও। পালাচ্ছিলো বোধ হয় দুজনে। এক ঢিলে দুই পাখী। অন্ধকার রাজ্যের মানুষ। ধরা না পড়ার উদ্বেগ সাহবকে আর কোনো পাড়ন করেবে না। এতদিনের তল্লাসী হয়রানির যবনিকা টেনে দিয়েছে নজর সিং।

নজর সিং কথা দিয়েছিল সাহবকে—জান দেংগে তব ভী ইজ্জৎ রুখেঙ্গে।

ইন্সপেক্টর পজন সিংও দৌড়ে এসে দাঁড়িয়েছে হীরের পেছনে।

সেলামঠুকে বলেছে নজর সিং—পরেশান আসান হুয়া সাহব! হয়রানির শেষ হল সাহব।

কান্নাভেজা গলায় বললে পজন—ক্যা কি· নজর! এ তুম ক্যা কিয়া।

মাথার টুপি খুলে ফেলে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ইলো নিস্প দ পাথর মুর্তির মতন। নিজের কছে নিজেকেও আশ্চর্য কছে নজর সিং-এর বিস্ময়বিমূঢ়।

ডাক্তারের বুকে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে হীর। পুত্রবিয়োগ ব্যথা গলে গলে পড়ছে দুচোখের জলে।

রক্তঝরা সীমান্তভূমি নিস্তব্ধ-নিথর। হিমশীতল।

সীমান্ত সাক্ষী—সীমারেখা সাক্ষী-বটের বোবাবেদনা গুমরে গুমরে উঠছে মাটির তলায়—দুপাশেরশেকড় আঁকড়ে ধরে প্রাণ-পণে।